সোনার তরী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

শিরোনাম-সূচী

প্রথম ছত্রের সূচী

সূচনা

জীবনের বিশেষ পর্বে কোনো বিশেষ প্রকৃতির কাব্য কোন্ উত্তেজনায় স্বাতন্ত্র্য নিয়ে দেখা দেয়, এ প্রশ্ন কবিকে জিজ্ঞাসা করলে তাকে বিপন্ন করা হয়। কী করে সে জানবে। প্রাণের প্রবৃদ্ধিতে যে-সব পরিবর্তন ঘটতে থাকে তার ভিতরকার রহস্য সহজে ধরা পড়ে না। গাছের সব ডাল একই দিকে একই রকম করে ছড়ায় না; এ দিকে, ও দিকে, তারা বেঁকেচুরে পাশ ফেরে; তার বৈজ্ঞানিক কারণ লুকিয়ে আছে আকাশে বাতাসে, আলোকে মাটিতে। গাছ যদি-বা চিন্তা করতে পারত তবু সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার এই মন্ত্রণাসভায় সে জায়গা পেত না, তার ভোট থাকত না; সে কেবল স্বীকার করে নেয় এই তার স্বভাবসংগত কাজ। বাইরে বসে আছে যে প্রাণবিজ্ঞানী সে বরঞ্চ অনেক খবর দিতে পারে।

কিন্তু, বাইরের লোক যদি তাদের পাওনার মূল্য নিয়েই সন্তুষ্ট না থাকে, যদি জিজ্ঞাসা করে মালগুলো কেমন করে কোন্ ছাঁচে তৈরি হল, তা হলে কবির মধ্যে যে আত্মসন্ধানের হেড-আপিস আছে সেখানে একবার তাগাদা করে দেখতে হয়। বস্তুত, 'সোনার তরী' তার নানা পণ্য নিয়ে কোন্ রপ্তানির ঘাট থেকে আমদানির ঘাটে এসে পৌঁছল, ইতিপূর্বে কখনো এ প্রশ্ন নিজেকে করি নি; কেননা, এর উত্তর দেওয়া আমার কর্তব্যের অঙ্গ নয়। মূলধন যার হাতে সেই মহাজনকে জিজ্ঞাসা করলে সে কথা কয় না; আমি তো মাঝি, হাতের কাছে যা জোটে তাই কুড়িয়ে নিয়ে এসে পৌঁছিয়ে দিই।

'মানসী'র অধিকাংশ কবিতা লিখেছিলুম পশ্চিমের এক শহরের বাংলাঘরে। নতুনের স্পর্শ আমার মনের মধ্যে জাগিয়েছিল নতুন

স্বাদের উত্তেজনা। সেখানে অপরিচিতের নির্জন অবকাশে নতুন নতুন ছন্দের যে বুনুনির কাজ করেছিলুম, এর পূর্বে তা আর কখনো করি নি। নূতনত্বের মধ্যে অসীমত্ব আছে, তারই এসেছিল ডাক; মন দিয়েছিল সাড়া। যা তার মধ্যে পূর্ব হতেই কুঁড়ির মতো শাখায় শাখায় লুকিয়ে ছিল, আলোতে তাই ফুটে উঠতে লাগল। কিন্তু 'সোনার তরী'র লেখা আর-এক পরিপ্রেক্ষিতে। বাংলাদেশের নদীতে নদীতে গ্রামে গ্রামে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছি, এর নূতনত্ব চলন্ত বৈচিত্র্যের নূতনত্ব। শুধু তাই নয়, পরিচয়ে অপরিচয়ে মেলামেশা করেছিল মনের মধ্যে। বাংলাদেশকে তো বলতে পারি নে বেগানা দেশ; তার ভাষা চিনি, তার স্বর চিনি। ক্ষণে ক্ষণে যতটুকু গোচরে এসেছিল তার চেয়ে অনেকখানি প্রবেশ করেছিল মনের অন্দরমহলে আপন বিচিত্র রূপ নিয়ে। সেই নিরন্তর জানা-শোনার অভ্যর্থনা পাচ্ছিলুম অন্তঃকরণে; যে উদ্‌বোধন এনেছিল তা স্পষ্ট বোঝা যাবে ছোটো গল্পের নিরন্তর ধারায়। সে ধারা আজও থামত না, যদি সেই উৎসের তীরে থেকে যেতুম, যদি না টেনে আনত বীরভূমের শুষ্ক প্রান্তরের কৃচ্ছ্রসাধনের ক্ষেত্রে।

আমি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা মানি নি, কতবার সমস্ত বৎসর ধরে পদ্মার আতিথ্য নিয়েছি— বৈশাখের খররৌদ্রতাপে, শ্রাবণের মুষলধারাবর্ষণে। পরপারে ছিল ছায়াঘন পল্লীর শ্যামশ্রী, এ পারে ছিল বালুচরের পাণ্ডুবর্ণ জনহীনতা, মাঝখানে পদ্মার চলমান স্রোতের পটে বুলিয়ে চলেছে দ্যুলোকের শিল্পী প্রহরে প্রহরে নানা বর্ণের আলোছায়ার তূলি। এইখানে নির্জন-সজনের নিত্যসংগম চলেছিল আমার জীবনে। অহরহ সুখদুঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবনধারার বিচিত্র কলরব এসে পৌঁচচ্ছিল আমার হৃদয়ে। মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল। তাদের জন্য চিন্তা করেছি, কাজ করেছি,

কর্তব্যের নানা সংকল্প বেঁধে তুলেছি— সেই সংকল্পের সূত্র আজও বিচ্ছিন্ন হয় নি আমার চিন্তায়। সেই মানুষের সংস্পর্শেই সাহিত্যের পথ এবং কর্মের পথ পাশাপাশি প্রসারিত হতে আরম্ভ হল আমার জীবনে। আমার বুদ্ধি এবং কল্পনা এবং ইচ্ছাকে উন্মুখ করে তুলেছিল এই সময়কার প্রবর্তনা, বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবলোকের মধ্যে নিত্যসচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা। এই সময়কার প্রথম কাব্যের ফসল ভরা হয়েছিল 'সোনার তরী'তে। তখনই সংশয় প্রকাশ করেছি এ তরী নিঃশেষে আমার ফসল তুলে নেবে, কিন্তু আমাকে নেবে কি।

বৈশাখ ১৩৪৭

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবিভ্রাতা শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন

মহাশয়ের করকমলে

তদীয় ভক্তের এই

প্রীতি-উপহার

সাদরে সমর্পিত

হইল

সোনার তরী

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা
ধান কাটা হল সারা,
ভরা নদী ক্ষুরধারা
খরপরশা।
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা॥

একখানি ছোটো খেত, আমি একেলা—
চারি দিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।
পরপারে দেখি আঁকা
তরুছায়া-মসী-মাখা
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা
প্রভাতবেলা—
এ পারেতে ছোটো খেত, আমি একেলা॥

গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে—
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।
ভরা পালে চলে যায়,
কোনো দিকে নাহি চায়,
ঢেউগুলি নিরুপায়
ভাঙে দু ধারে—
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে॥

ওগো, তুমি কোথা যাও কোন্ বিদেশে—
বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে।
যেয়ো যেথা যেতে চাও
যারে খুশি তারে দাও—
শুধু তুমি নিয়ে যাও
ক্ষণিক হেসে
আমার সোনার ধান কূলেতে এসে॥

যত চাও তত লও তরণী-'পরে।
আর আছে ?— আর নাই, দিয়েছি ভরে।
এত কাল নদীকূলে
যাহা লয়ে ছিনু ভুলে
সকলই দিলাম তুলে
থরে বিথরে—
এখন আমারে লহো করুণা ক'রে॥

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই— ছোটো সে তরী
আমারই সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।
শ্রাবণগগন ঘিরে
ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,
শূন্য নদীর তীরে
রহিনু পড়ি—
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী॥

শিলাইদহ। বোট
ফাল্গুন ১২৯৮

বিম্ববতী

রূপকথা

সযত্নে সাজিল রানী, বাঁধিল কবরী,
নবঘনস্নিগ্ধবর্ণ নব নীলাম্বরী
পরিল অনেক সাধে। তার পরে ধীরে
গুপ্ত আবরণ খুলি আনিল বাহিরে
মায়াময় কনকদর্পণ। মন্ত্র পড়ি
শুধাইল তারে, 'কহো মোরে সত্য করি
সর্বশ্রেষ্ঠ রূপসী কে ধরায় বিরাজে।'
ফুটিয়া উঠিল ধীরে মুকুরের মাঝে
মধুমাখা হাসি-আঁকা একখানি মুখ,
দেখিয়া বিদারি গেল মহিষীর বুক—
রাজকন্যা বিম্ববতী সতিনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপসী সে সবাকার চেয়ে॥

তার পরদিন রানী প্রবালের হার
পরিল গলায়। খুলি দিল কেশভার
আজানুচুম্বিত। গোলাপি অঞ্চলখানি
লজ্জার আভাস-সম, বক্ষে দিল টানি।
সুবর্ণমুকুর রাখি কোলের উপরে
শুধাইল মন্ত্র পড়ি, 'কহো সত্য করে

ধরামাঝে সব চেয়ে কে আজি রূপসী।'
দর্পণে উঠিল ফুটে সেই মুখশশী।
কাঁপিয়া কহিল রানী, অগ্নিসম জ্বালা,
'পরালেম তারে আমি বিষফুলমালা,
তবু মরিল না জ্ব'লে সতিনের মেয়ে!
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে!'

তার পরদিনে— আবার রুধিল দ্বার
শয়নমন্দিরে। পরিল মুক্তার হার,
ভালে সিন্দুরের টিপ, নয়নে কাজল,
রক্তাম্বর পট্টবাস, সোনার আঁচল।
শুধাইল দর্পণেরে, 'কহো সত্য করি
ধরাতলে সব চেয়ে কে আজি সুন্দরী।'
উজ্জ্বল কনকপটে ফুটিয়া উঠিল
সেই হাসিমাখা মুখ। হিংসায় লুটিল
রানী শয্যার উপরে। কহিল কাঁদিয়া,
'বনে পাঠালেম তারে কঠিন বাঁধিয়া,
এখনো সে মরিল না সতিনের মেয়ে!
ধরাতলে রূপসী সে সবাকার চেয়ে!'

তার পরদিনে— আবার সাজিল সুখে
নব অলংকারে; বিরচিল হাসিমুখে

কবরী নূতন ছাঁদে বাঁকাইয়া গ্রীবা।
পরিল যতন করি নবরৌদ্রবিভা
নব পীতবাস। দর্পণ সম্মুখে ধ'রে
শুধাইল মন্ত্র পড়ি, 'সত্য কহো মোরে
ধরামাঝে সব চেয়ে কে আজি রূপসী।'
সেই হাসি সেই মুখ উঠিল বিকশি
মোহনমুকুরে। রানী কহিল জ্বলিয়া,
'বিষফল খাওয়ালেম তাহারে ছলিয়া,
তবুও সে মরিল না সতিনের মেয়ে!
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে!'

তার পরদিনে রানী কনকরতনে
খচিত করিল তনু অনেক যতনে।
দর্পণেরে শুধাইল বহু দর্পভরে,
'সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ কার বল্ সত্য করে।'
দুইটি সুন্দর মুখ দেখা দিল হাসি—
রাজপুত্র রাজকন্যা দোঁহে পাশাপাশি
বিবাহের বেশে। অঙ্গে অঙ্গে শিরা যত
রানীরে দংশিল যেন বৃশ্চিকের মতো।
চীৎকারি কহিল রানী কর হানি বুকে,
'মরিতে দেখেছি তারে আপন সম্মুখে,
কার প্রেমে বাঁচিল সে সতিনের মেয়ে!
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে।'

ঘষিতে লাগিল রানী কনকমুকুর
বালু দিয়ে— প্রতিবিম্ব না হইল দূর।
মসী লেপি দিল, তবু ছবি ঢাকিল না।
অগ্নি দিল, তবুও তো গলিল না সোনা।
আছাড়ি ফেলিল ভূমে প্রাণপণ বলে,
ভাঙিল না সে মায়াদর্পণ। ভূমিতলে
চকিতে পড়িল রানী, টুটি গেল প্রাণ—
সর্বাঙ্গে হীরকমণি অগ্নির সমান
লাগিল জ্বলিতে। ভূমে পড়ি তারি পাশে
কনকদর্পণে দুটি হাসিমুখ হাসে।
বিম্ববতী, মহিষীর সতিনের মেয়ে
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে॥

শিলাইদহ
ফাল্গুন ১২৯৮

শৈশবসন্ধ্যা

ধীরে ধীরে বিস্তারিছে ঘেরি চারি ধার
শ্রান্তি আর শান্তি আর সন্ধ্যা-অন্ধকার
মায়ের অঞ্চল-সম। দাঁড়ায়ে একাকী
মেলিয়া পশ্চিম-পানে অনিমেষ আঁখি
স্তব্ধ চেয়ে আছি। আপনারে মগ্ন করি
অতলের তলে, ধীরে লইতেছি ভরি
জীবনের মাঝে আজিকার এই ছবি—
জনশূন্য নদীতীর, অস্তমান রবি,
ম্লান মূর্ছাতুর আলো— রোদন-অরুণ
ক্লান্ত নয়নের যেন দৃষ্টি সকরুণ
স্থির বাক্যহীন— এই গভীর বিষাদ,
জলে স্থলে চরাচরে শ্রান্তি অবসাদ॥

সহসা উঠিল গাহি কোন্‌খান হতে
বন-অন্ধকার-ঘন কোন্ গ্রামপথে
যেতে যেতে গৃহমুখে বালকপথিক।
উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর নিশ্চিন্ত নির্ভীক
কাঁপিছে সপ্তম স্বরে, তীব্র উচ্চতান
সন্ধ্যারে কাটিয়া যেন করিবে দুখান।
দেখিতে না পাই তীরে। ওই-যে সম্মুখে
প্রান্তরের সর্বপ্রান্তে দক্ষিণের মুখে

আখের খেতের পারে কদলী সুপারি
নিবিড় বাঁশের বন, মাঝখানে তারি
বিশ্রাম করিছে গ্রাম, হোথা আঁখি ধায়।
হোথা কোন্ গৃহপানে গেয়ে চলে যায়
কোন্ রাখালের ছেলে ; নাহি ভাবে কিছু,
নাহি চায় শূন্যপানে, নাহি আগুপিছু ॥

দেখে শুনে মনে পড়ে সেই সন্ধ্যাবেলা
শৈশবের ; কত গল্প, কত বাল্যখেলা,
এক বিছানায় শুয়ে মোরা সঙ্গী তিন—
সে কি আজিকার কথা, হল কত দিন !
এখনো কি বৃদ্ধ হয়ে যায় নি সংসার ?
ভোলে নাই খেলাধুলা ? নয়নে তাহার
আসে নাই নিদ্রাবেশ শান্ত সুশীতল ?
বাল্যের খেলানাগুলি করিয়া বদল
পায় নি কঠিন জ্ঞান ? দাঁড়ায়ে হেথায়
নির্জন মাঠের মাঝে নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়
শুনিয়া কাহার গান পড়ি গেল মনে—
কত শত নদীতীরে, কত আম্রবনে,
কাংস্যঘণ্টামুখরিত মন্দিরের ধারে,
কত শস্যক্ষেত্রপ্রান্তে, পুকুরের পাড়ে,
গৃহে গৃহে জাগিতেছে নব হাসিমুখ,
নবীন-হৃদয়-ভরা নব নব সুখ,

কত অসম্ভব কথা, অপূর্ব কল্পনা,
কত অমূলক আশা, অশেষ কামনা,
অনন্ত বিশ্বাস! দাঁড়াইয়া অন্ধকারে
দেখিনু নক্ষত্রালোকে অসীম সংসারে
রয়েছে পৃথিবী ভরি বালিকা বালক,
সন্ধ্যাশয্যা, মার মুখ, দীপের আলোক ॥

ফাল্গুন ১২৯৮

রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে

রূপকথা

প্রভাতে

রাজার ছেলে যেত পাঠশালায়,
রাজার মেয়ে যেত তথা।
দুজনে দেখা হত পথের মাঝে,
কে জানে কবেকার কথা।
রাজার মেয়ে দূরে সরে যেত,
চুলের ফুল তার পড়ে যেত,
রাজার ছেলে এসে তুলে দিত
ফুলের সাথে বনলতা।
রাজার ছেলে যেত পাঠশালায়,
রাজার মেয়ে যেত তথা।
পথের দুই পাশে ফুটেছে ফুল,
পাখিরা গান গাহে গাছে।
রাজার মেয়ে আগে এগিয়ে চলে,
রাজার ছেলে যায় পাছে॥

মধ্যাহ্নে

উপরে ব'সে পড়ে রাজার মেয়ে,
রাজার ছেলে নীচে বসে।

পুঁথি খুলিয়া শেখে কত কী ভাষা,
খড়ি পাতিয়া আঁক কষে।
রাজার মেয়ে পড়া যায় ভুলে,
পুঁথিটি হাত হতে পড়ে খুলে,
রাজার ছেলে এসে দেয় তুলে—
আবার প'ড়ে যায় খসে।
উপরে ব'সে পড়ে রাজার মেয়ে,
রাজার ছেলে নীচে বসে।
দুপুরে খরতাপ, বকুলশাখে
কোকিল কুহু কুহরিছে।
রাজার ছেলে চায় উপর-পানে,
রাজার মেয়ে চায় নীচে ॥

সায়াহ্নে

রাজার ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসে,
রাজার মেয়ে যায় ঘরে।
খুলিয়া গলা হতে মোতির মালা
রাজার মেয়ে খেলা করে।
পথে সে মালাখানি গেল ভুলে,
রাজার ছেলে সেটি নিল তুলে,
আপন মণিহার মনোভুলে
দিল সে বালিকার করে।

রাজার ছেলে ঘরে ফিরিয়া এল,
রাজার মেয়ে গেল ঘরে।
শ্রান্ত রবি ধীরে অস্ত যায়
নদীর তীরে এক-শেষে।
সাঙ্গ হয়ে গেল দোঁহার পাঠ,
যে যার গেল নিজ দেশে॥

নিশীথে

রাজার মেয়ে শোয় সোনার খাটে,
স্বপনে দেখে রূপরাশি।
রুপোর খাটে শুয়ে রাজার ছেলে
দেখিছে কার সুধাহাসি।
করিছে আনাগোনা সুখ দুখ,
কখনো দুরুদুরু করে বুক,
অধরে কভু কাঁপে হাসিটুক্,
নয়ন কভু যায় ভাসি।
রাজার মেয়ে কার দেখিছে মুখ,
রাজার ছেলে কার হাসি।
বাদর ঝরঝর, গরজে মেঘ,
পবন করে মাতামাতি।
শিথানে মাথা রাখি বিথান বেশ,
স্বপনে কেটে যায় রাতি॥

জোড়াসাঁকো। কলিকাতা
চৈত্র ১২৯৮

নিদ্রিতা

রাজার ছেলে ফিরেছি দেশে দেশে
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার।
যেখানে যত মধুর মুখ আছে
বাকি তো কিছু রাখি নি দেখিবার।
কেহ-বা ডেকে কয়েছে দুটো কথা,
কেহ-বা চেয়ে করেছে আঁখি নত;
কাহারো হাসি ছুরির মতো কাটে,
কাহারো হাসি আঁখিজলেরই মতো।
গরবে কেহ গিয়েছে নিজ ঘর,
কাঁদিয়া কেহ চেয়েছে ফিরে ফিরে;
কেহ-বা কারে কহে নি কোনো কথা,
কেহ-বা গান গেয়েছে ধীরে ধীরে।
এমনি করে ফিরেছি দেশে দেশে;
অনেক দূরে তেপান্তর-শেষে
ঘুমের দেশে ঘুমায় রাজবালা,
তাহারি গলে এসেছি দিয়ে মালা॥

একদা রাতে নবীন যৌবনে
স্বপ্ন হতে উঠিনু চমকিয়া;
বাহিরে এসে দাঁড়ানু একবার,
ধরার পানে দেখিনু নিরখিয়া।

শীর্ণ হয়ে এসেছে শুকতারা,
পূর্বতটে হতেছে নিশি ভোর ;
আকাশকোণে বিকাশে জাগরণ,
ধরণীতলে ভাঙে নি ঘুমঘোর।
সমুখে প'ড়ে দীর্ঘ রাজপথ,
দু ধারে তারি দাঁড়ায়ে তরুসার ;
নয়ন মেলি সুদূরপানে চেয়ে
আপনমনে ভাবিনু একবার—
আমারি মতো আজি এ নিশিশেষে
ধরার মাঝে নূতন কোন্ দেশে
দুগ্ধফেনশয়ন করি আলা
স্বপ্ন দেখে ঘুমায়ে রাজবালা ॥

অশ্ব চড়ি তখনি বাহিরিনু,
কত যে দেশ বিদেশ হনু পার ;
একদা এক ধূসর সন্ধ্যায়
ঘুমের দেশে লভিনু পুরদ্বার।
সবাই সেথা অচল অচেতন,
কোথাও জেগে নাইকো জনপ্রাণী ;
নদীর তীরে জলের কলতানে
ঘুমায়ে আছে বিপুল পুরীখানি।
ফেলিতে পদ সাহস নাহি মানি,
নিমেষে পাছে সকল দেশ জাগে।

প্রাসাদমাঝে পশিনু সাবধানে,
শঙ্কা মোর চলিল আগে আগে।
ঘুমায় রাজা, ঘুমায় রানীমাতা,
কুমার-সাথে ঘুমায় রাজভ্রাতা ;
একটি ঘরে রত্নদীপ জ্বালা,
ঘুমায়ে সেথা রয়েছে রাজবালা

কমলফুলবিমল শেজখানি,
নিলীন তাহে কোমল তনুলতা ;
মুখের পানে চাহিনু অনিমেষে,
বাজিল বুকে সুখের মতো ব্যথা।
মেঘের মতো গুচ্ছ কেশরাশি
শিথান ঢাকি পড়েছে ভারে ভারে ;
একটি বাহু বক্ষ'পরে পড়ি,
একটি বাহু লুটায় এক ধারে।
আঁচলখানি পড়েছে খসি পাশে,
কাঁচলখানি পড়িবে বুঝি টুটি ;
পত্রপুটে রয়েছে যেন ঢাকা
অনাঘ্রাত পূজার ফুল দুটি।
দেখিনু তারে, উপমা নাহি জানি—
ঘুমের দেশে স্বপন একখানি,
পালঙ্কেতে মগন রাজবালা
আপন ভরা লাবণ্যে নিরালা ॥

ব্যাকুল বুকে চাপিনু দুই বাহু,
না মানে বাধা হৃদয়কম্পন ;
ভূতলে বসি আনত করি শির
মুদিত আঁখি করিনু চুম্বন।
পাতার ফাঁকে আঁখির তারা দুটি
তাহারি পানে চাহিনু এক মনে ;
দ্বারের ফাঁকে দেখিতে চাহি যেন
কী আছে কোথা নিভৃত নিকেতনে।
ভূর্জপাতে কাজলমসী দিয়া
লিখিয়া দিনু আপন নাম ধাম ;
লিখিনু, 'অয়ি নিদ্রানিমগনা,
আমার প্রাণ তোমারে সঁপিলাম।'
যতন করি কনকসুতে গাঁথি
রতনহারে বাঁধিয়া দিনু পাঁতি ;
ঘুমের দেশে ঘুমায় রাজবালা
তাহারি গলে পরায়ে দিনু মালা ॥

শান্তিনিকেতন
১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

সুপ্তোত্থিতা

ঘুমের দেশে ভাঙিল ঘুম,
উঠিল কলস্বর।
গাছের শাখে জাগিল পাখি,
কুসুমে মধুকর।
অশ্বশালে জাগিল ঘোড়া,
হস্তীশালে হাতি।
মল্লশালে মল্ল জাগি
ফুলায় পুন ছাতি।
জাগিল পথে প্রহরীদল,
দুয়ারে জাগে দ্বারী।
আকাশে চেয়ে নিরখে বেলা
জাগিয়া নরনারী।
উঠিল জাগি রাজাধিরাজ,
জাগিল রানীমাতা।
কচালি আঁখি কুমার-সাথে
জাগিল রাজভ্রাতা।
নিভৃত ঘরে ধূপের বাস,
রতনদীপ জ্বালা,
জাগিয়া উঠি শয্যাতলে
শুধালো রাজবালা—
'কে পরালে মালা!'

খসিয়া-পড়া আঁচলখানি
　　বক্ষে তুলি দিল।
আপনপানে নেহারি চেয়ে
　　শরমে শিহরিল।
ত্রস্ত হয়ে চকিত চোখে
　　চাহিল চারি দিকে—
বিজন গৃহ, রতনদীপ
　　জ্বলিছে অনিমিখে।
গলার মালা খুলিয়া লয়ে
　　ধরিয়া ঢুটি করে
সোনার-স্থতে-যতনে-গাঁথা
　　লিখনখানি পড়ে।
পড়িল নাম, পড়িল ধাম,
　　পড়িল লিপি তার,
কোলের 'পরে বিছায়ে দিয়ে
　　পড়িল শতবার।
শয়নশেষে রহিল বসে,
　　ভাবিল রাজবালা—
'আপন ঘরে ঘুমায়েছিনু
　　নিতান্ত নিরালা,
　　　কে পরালে মালা!'

নূতন-জাগা কুঞ্জবনে
কুহরি উঠে পিক,
বসন্তের চুম্বনেতে
বিবশ দশ দিক।
বাতাস ঘরে প্রবেশ করে
ব্যাকুল উচ্ছ্বাসে,
নবীন ফুলমঞ্জরীর
গন্ধ লয়ে আসে।
জাগিয়া উঠি বৈতালিক
গাহিছে জয়গান,
প্রাসাদদ্বারে ললিত স্বরে
বাঁশিতে উঠে তান।
শীতলছায়া নদীর পথে
কলসে লয়ে বারি,
কাঁকন বাজে, নূপুর বাজে,
চলিছে পুরনারী।
কাননপথে মর্মরিয়া
কাঁপিছে গাছপালা,
আধেক মুদি নয়নদুটি
ভাবিছে রাজবালা—
'কে পরালে মালা!'

বারেক মালা গলায় পরে,
বারেক লহে খুলি,
দুইটি করে চাপিয়া ধরে
বুকের কাছে তুলি।
শয়ন'পরে মেলায়ে দিয়ে
তৃষিত চেয়ে রয়,
এমনি করে পাইবে যেন
অধিক পরিচয়।
জগতে আজ কত-না ধ্বনি
উঠিছে কত ছলে,
একটি আছে গোপন কথা
সে কেহ নাহি বলে।
বাতাস শুধু কানের কাছে
বহিয়া যায় হুহু,
কোকিল শুধু অবিশ্রাম
ডাকিছে কুহু-কুহু।
নিভৃত ঘরে পরান-মন
একান্ত উতালা,
শয়নশেষে নীরবে ব'সে
ভাবিছে রাজবালা—
'কে পরালে মালা!'

কেমন বীর-মুরতি তার
মাধুরী দিয়ে মিশা—
দীপ্তি-ভরা নয়নমাঝে
তৃপ্তিহীন তৃষা।
স্বপ্নে তারে দেখেছে যেন
এমনি মনে লয়—
ভুলিয়া গেছে, রয়েছে শুধু
অসীম বিস্ময়।
পারশে যেন বসিয়াছিল,
ধরিয়াছিল কর—
এখনো তার পরশে যেন
সরস কলেবর।
চমকি মুখ দু হাতে ঢাকে,
শরমে টুটে মন—
লজ্জাহীন প্রদীপ কেন
নিভে নি সেই ক্ষণ!
কণ্ঠ হতে ফেলিল হার
যেন বিজুলিজ্বালা,
শয়ন'পরে লুটায়ে প'ড়ে
ভাবিল রাজবালা—
'কে পরালে মালা!'

এমনি ধীরে একটি ক'রে
কাটিছে দিন রাতি,
বসন্ত সে বিদায় নিল
লইয়া যূথী জাতি।
সঘন মেঘে বরষা আসে,
বরষে ঝরঝর্—
কাননে ফুটে নবমালতী
কদম্বকেশর।
স্বচ্ছ হাসি শরৎ আসে
পূর্ণিমামালিকা,
সকল বন আকুল করে
শুভ্র শেফালিকা।
আসিল শীত সঙ্গে লয়ে
দীর্ঘ দুখনিশা,
শিশির-ঝরা কুন্দফুলে
হাসিয়া কাঁদে দিশা।
ফাগুন মাস আবার এল
বহিয়া ফুলডালা,
জানালাপাশে একেলা ব'সে
ভাবিছে রাজবালা—
'কে পরালে মালা!'

শান্তিনিকেতন
১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

তোমরা ও আমরা

তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও
কুলুকুলুকল নদীর স্রোতের মতো।
আমরা তীরেতে দাঁড়ায়ে চাহিয়া থাকি,
মরমে গুমরি মরিছে কামনা কত।
আপনা-আপনি কানাকানি কর সুখে,
কৌতুকছটা উছলিছে চোখে মুখে,
কমলচরণ পড়িছে ধরণীমাঝে,
কনকনূপুর রিনিকি ঝিনিকি বাজে॥

অঙ্গে অঙ্গ বাঁধিছ রঙ্গপাশে,
বাহুতে বাহুতে জড়িত ললিত লতা।
ইঙ্গিতরসে ধ্বনিয়া উঠিছে হাসি,
নয়নে নয়নে বহিছে গোপন কথা।
আঁখি নত করি একেলা গাঁথিছ ফুল,
মুকুর লইয়া যতনে বাঁধিছ চুল।
গোপন হৃদয়ে আপনি করিছ খেলা—
কী কথা ভাবিছ, কেমনে কাটিছে বেলা

চকিতে পলকে অলক উড়িয়া পড়ে,
ঈষৎ হেলিয়া আঁচল মেলিয়া যাও—
নিমেষ ফেলিতে আঁখি না মেলিতে, ত্বরা
নয়নের আড়ে না জানি কাহারে চাও।
যৌবনরাশি টুটিতে লুটিতে চায়,
বসনে শাসনে বাঁধিয়া রেখেছ তায়,
তবু শতবার শতধা হইয়া ফুটে—
চলিতে ফিরিতে ঝলকি চলকি উঠে॥

আমরা মূর্খ কহিতে জানি নে কথা,
কী কথা বলিতে কী কথা বলিয়া ফেলি।
অসময়ে গিয়ে লয়ে আপনার মন
পদতলে দিয়ে চেয়ে থাকি আঁখি মেলি।
তোমরা দেখিয়া চুপিচুপি কথা কও,
সখীতে সখীতে হাসিয়া অধীর হও,
বসন-আঁচল বুকেতে টানিয়া লয়ে
হেসে চলে যাও আশার অতীত হয়ে॥

আমরা বৃহৎ অবোধ ঝড়ের মতো
আপন আবেগে ছুটিয়া চলিয়া আসি,
বিপুল আঁধারে অসীম আকাশ ছেয়ে
টুটিবারে চাহি আপন হৃদয়রাশি।

তোমরা বিজুলি হাসিতে হাসিতে চাও,
আঁধার ছেদিয়া মরম বিঁধিয়া দাও—
গগনের গায়ে আগুনের রেখা আঁকি
চকিত চরণে চলে যাও দিয়ে ফাঁকি॥

অযতনে বিধি গড়েছে মোদের দেহ,
নয়ন অধর দেয় নি ভাষায় ভরে।
মোহনমধুর মন্ত্র জানি নে মোরা,
আপনা প্রকাশ করিব কেমন করে?
তোমরা কোথায় আমরা কোথায় আছি,
কোনো সুলগনে হব না কি কাছাকাছি—
তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাবে,
আমরা দাঁড়ায়ে রহিব এমনি ভাবে!

[বোলপুর]
১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

সোনার বাঁধন

বন্দী হয়ে আছ তুমি সুমধুর স্নেহে,
অয়ি গৃহলক্ষ্মী, এই করুণক্রন্দন
এই দুঃখদৈন্যে-ভরা মানবের গেহে!
তাই দুটি বাহু-'পরে সুন্দরবন্ধন
সোনার কঙ্কণদুটি বহিতেছ দেহে
শুভচিহ্ন, নিখিলের নয়নন্দন।
পুরুষের দুই বাহু কিণাঙ্ককঠিন
সংসারসংগ্রামে, সদা বন্ধনবিহীন;
যুদ্ধদ্বন্দ্ব যতকিছু নিদারুণ কাজে
বহ্নিবাণ বজ্রসম সর্বত্র স্বাধীন।
তুমি বদ্ধ স্নেহ-প্রেম-করুণার মাঝে—
শুধু শুভকর্ম, শুধু সেবা নিশিদিন।
তোমার বাহুতে তাই কে দিয়াছে টানি
দুইটি সোনার গণ্ডি, কাঁকন দুখানি॥

শান্তিনিকেতন
১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

বর্ষাযাপন

রাজধানী কলিকাতা ; তেতলার ছাতে
কাঠের কুঠরি এক ধারে ;
আলো আসে পূর্বদিকে প্রথম প্রভাতে,
বায়ু আসে দক্ষিণের দ্বারে ॥

মেঝেতে বিছানা পাতা, দুয়ারে রাখিয়া মাথা
বাহিরে আঁখিরে দিই ছুটি—
সৌধছাদ শত শত ঢাকিয়া রহস্য কত
আকাশেরে করিছে ভ্রূকুটি।
নিকটে জানালা-গায় এক কোণে আলিসায়
একটুকু সবুজের খেলা,
শিশু অশথের গাছ আপন ছায়ার নাচ
সারা দিন দেখিছে একেলা।
দিগন্তের চারি পাশে আষাঢ় নামিয়া আসে,
বর্ষা আসে হইয়া ঘোরালো ;
সমস্ত-আকাশ-জোড়া গরজে ইন্দ্রের ঘোড়া,
চিকিমিকে বিদ্যুতের আলো।
চারি দিকে অবিরল ঝরঝর বৃষ্টিজল
এই ছোটো প্রান্তঘরটিরে
দেয় নির্বাসিত করি দশ দিক অপহরি
সমুদয় বিশ্বের বাহিরে ॥

বসে বসে সঙ্গীহীন ভালো লাগে কিছু দিন
পড়িবারে মেঘদূতকথা—
বাহিরে দিবসরাতি বায়ু করে মাতামাতি
বহিয়া বিফল ব্যাকুলতা ;
বহুপূর্ব আষাঢ়ের মেঘাচ্ছন্ন ভারতের
নগ নদী নগরী বাহিয়া—
কত শ্রুতিমধু নাম— কত দেশ কত গ্রাম
দেখে যাই চাহিয়া চাহিয়া।
ভালো করে দোঁহে চিনি বিরহী ও বিরহিণী
জগতের দু পারে দুজন—
প্রাণে প্রাণে পড়ে টান, মাঝে মহা ব্যবধান,
মনে মনে কল্পনাসৃজন।
যক্ষবধূ গৃহকোণে ফুল নিয়ে দিন গণে,
দেখে শুনে ফিরে আসি চলি।
বর্ষা আসে ঘনরোলে, যত্নে টেনে লই কোলে
গোবিন্দদাসের পদাবলী।
সুর ক'রে বার বার পড়ি বর্ষা-অভিসার—
অন্ধকার যমুনার তীর,
নিশীথে নবীনা রাধা নাহি মানে কোনো বাধা,
খুঁজিতেছে নিকুঞ্জকুটির।
অনুক্ষণ দরদর বারি ঝরে ঝরঝর,
তাহে অতি দূরতর বন ;
ঘরে ঘরে রুদ্ধ দ্বার, সঙ্গে কেহ নাহি আর—
শুধু এক কিশোর মদন ॥

আষাঢ় হতেছে শেষ, মিশায়ে মল্লার দেশ
রচি ভরা-বাদরের সুর।
খুলিয়া প্রথম পাতা গীতগোবিন্দের গাথা
গাহি 'মেঘে অম্বর মেদুর'।
স্তব্ধ রাত্রি দ্বিপ্রহরে ঝুপ্‌ঝুপ্‌ বৃষ্টি পড়ে—
শুয়ে শুয়ে সুখ-অনিদ্রায়
'রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া-গরজন'
সেই গান মনে পড়ে যায়।
'পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত-চীর-অঙ্গে'
মনসুখে নিদ্রায় মগন—
সেই ছবি জাগে মনে পুরাতন বৃন্দাবনে
রাধিকার নির্জন স্বপন।
মৃদু মৃদু বহে শ্বাস, অধরে লাগিছে হাস,
কেঁপে উঠে মুদিত পলক ;
বাহুতে মাথাটি থুয়ে একাকিনী আছে শুয়ে,
গৃহকোণে ম্লান দীপালোক।
গিরিশিরে মেঘ ডাকে, বৃষ্টি ঝরে তরুশাখে
দাদুরি ডাকিছে সারা রাতি—
হেনকালে কী না ঘটে, এ সময়ে আসে বটে
একা ঘরে স্বপনের সাথি।
মরি মরি স্বপ্নশেষে পুলকিত রসাবেশে
যখন সে জাগিল একাকী
দেখিল বিজন ঘরে দীপ নিবু-নিবু করে,
প্রহরী প্রহর গেল হাঁকি।

বাড়িছে বৃষ্টির বেগ, থেকে থেকে ডাকে মেঘ,
ঝিল্লিরব পৃথিবী ব্যাপিয়া।
সেই ঘনঘোরা নিশি— স্বপ্নে জাগরণে মিশি
না জানি কেমন করে হিয়া॥

লয়ে পুঁথি দু-চারিটি নেড়েচেড়ে ইটি-সিটি
এইমতো কাটে দিন রাত।
তার পরে টানি লই বিদেশী কাব্যের বই,
উলটি-পালটি দেখি পাত—
কোথা রে বর্ষার ছায়া, অন্ধকার মেঘমায়া,
ঝরঝর ধ্বনি অহরহ,
কোথায় সে কর্মহীন একান্তে আপনে লীন
জীবনের নিগূঢ় বিরহ!
বর্ষার সমান সুরে অন্তর বাহির পুরে
সংগীতের মুষলধারায়
পরানের বহু দূর কূলে কূলে ভরপুর,
বিদেশী কাব্যে সে কোথা হায়!
তখন সে পুঁথি ফেলি দুয়ারে আসন মেলি
বসি গিয়ে আপনার মনে—
কিছু করিবার নাই, চেয়ে চেয়ে ভাবি তাই
দীর্ঘ দিন কাটিবে কেমনে।
মাথাটি করিয়া নিচু বসে বসে রচি কিছু
বহু যত্নে সারা দিন ধ'রে—

ইচ্ছা করে অবিরত আপনার মনোমত
গল্প লিখি একেকটি ক'রে।
ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা, ছোটো ছোটো দুঃখকথা
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি—
তারি দু-চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা, ঘটনার ঘনঘটা—
নাহি তত্ত্ব, নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে, সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।
জগতের শত শত অসমাপ্ত কথা যত,
অকালের বিচ্ছিন্ন মুকুল,
অজ্ঞাত জীবনগুলা, অখ্যাত কীর্তির ধুলা,
কত ভাব, কত ভয় ভুল—
সংসারের দশ দিশি ঝরিতেছে অহর্নিশি
ঝরঝর বরষার মতো—
ক্ষণ-অশ্রু ক্ষণহাসি পড়িতেছে রাশি রাশি,
শব্দ তার শুনি অবিরত।
সেই-সব হেলাফেলা নিমেষের লীলাখেলা
চারি দিকে করি স্তূপাকার
তাই দিয়ে করি সৃষ্টি একটি বিস্মৃতিবৃষ্টি
জীবনের শ্রাবণনিশার॥

শান্তিনিকেতন
১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯
পূর্বারম্ভ

হিং টিং ছট্

স্বপ্নমঙ্গল

স্বপ্ন দেখেছেন রাত্রে হবুচন্দ্র ভূপ,
অর্থ তার ভাবি ভাবি গবুচন্দ্র চুপ।
শিয়রে বসিয়া যেন তিনটে বাঁদরে
উকুন বাছিতেছিল পরম আদরে।
একটু নড়িতে গেলে গালে মারে চড়,
চোখে মুখে লাগে তার নখের আঁচড়।
সহসা মিলালো তারা, এল এক বেদে,
'পাখি উড়ে গেছে' ব'লে মরে কেঁদে কেঁদে ;
সম্মুখে রাজারে দেখি তুলি নিল ঘাড়ে,
ঝুলায়ে বসায়ে দিল উচ্চ এক দাঁড়ে।
নীচেতে দাঁড়ায়ে এক বুড়ি থুড়্থুড়ি
হাসিয়া পায়ের তলে দেয় সুড়্সুড়ি।
রাজা বলে, 'কী আপদ !' কেহ নাহি ছাড়ে—
পা দুটা তুলিতে চাহে, তুলিতে না পারে।
পাখির মতন রাজা করে ঝট্পট্,
বেদে কানে কানে বলে 'হিং টিং ছট্'।
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান ;
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান ॥

হবুপুর রাজ্যে আজ দিন ছয়-সাত
চোখে কারো নিদ্রা নাই, পেটে নাই ভাত।
শীর্ণ গালে হাত দিয়ে নত করি শির
রাজ্যসুদ্ধ বালবৃদ্ধ ভেবেই অস্থির।
ছেলেরা ভুলেছে খেলা, পণ্ডিতেরা পাঠ,
মেয়েরা করেছে চুপ— এতই বিভ্রাট।
সারি সারি বসে গেছে, কথা নাহি মুখে—
চিন্তা যত ভারী হয় মাথা পড়ে ঝুঁকে।
ভুঁইফোঁড়া তত্ত্ব যেন ভূমিতলে খোঁজে,
সবে যেন বসে গেছে নিরাকার ভোজে।
মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া উৎকট
হঠাৎ ফুকারি উঠে 'হিং টিং ছট্‌'।
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান ;
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান॥

চারি দিক হতে এল পণ্ডিতের দল—
অযোধ্যা কনোজ কাঞ্চী মগধ কোশল।
উজ্জয়িনী হতে এল বুধ-অবতংস
কালিদাস-কবীন্দ্রের ভাগিনেয়-বংশ।
মোটা মোটা পুঁথি লয়ে উলটায় পাতা,
ঘন ঘন নাড়ে বসি টিকিসুদ্ধ মাথা।
বড়ো বড়ো মস্তকের পাকা শস্যখেত
বাতাসে দুলিছে যেন শীর্ষ-সমেত।

কেহ শ্রুতি, কেহ স্মৃতি, কেহ-বা পুরাণ,
কেহ ব্যাকরণ দেখে, কেহ অভিধান।
কোনোখানে নাহি পায় অর্থ কোনোরূপ,
বেড়ে ওঠে অনুস্বর বিসর্গের স্তূপ।
চুপ করে বসে থাকে, বিষম সংকট—
থেকে থেকে হেঁকে ওঠে ‘হিং টিং ছট্’।
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান ;
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান॥

কহিলেন হতাশ্বাস হবুচন্দ্ররাজ,
‘ম্লেচ্ছদেশে আছে নাকি পণ্ডিতসমাজ,
তাহাদের ডেকে আনো যে যেখানে আছে—
অর্থ যদি ধরা পড়ে তাহাদের কাছে।’
কটা-চুল নীলচক্ষু কপিশকপোল
যবন পণ্ডিত আসে, বাজে ঢাক ঢোল।
গায়ে কালো মোটা মোটা ছাঁটাছোঁটা কুর্তি—
গ্রীষ্মতাপে উষ্মা বাড়ে, ভারি উগ্রমূর্তি।
ভূমিকা না করি কিছু ঘড়ি খুলি কয়,
‘সতেরো মিনিট মাত্র রয়েছে সময়,
কথা যদি থাকে কিছু বলো চট্‌পট্।’
সভাসুদ্ধ বলি উঠে ‘হিং টিং ছট্’।
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান ;
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান॥

স্বপ্ন শুনি ম্লেচ্ছমুখ রাঙা টক্‌টকে,
আগুন ছুটিতে চায় মুখে আর চোখে।
হানিয়া দক্ষিণমুষ্টি বামকরতলে
'ডেকে এনে পরিহাস!' রেগেমেগে বলে।
ফরাসি পণ্ডিত ছিল; হাস্যোজ্জ্বলমুখে
কহিল নোয়ায়ে মাথা হস্ত রাখি বুকে,
'স্বপ্ন যাহা শুনিলাম রাজযোগ্য বটে;
হেন স্বপ্ন সকলের অদৃষ্টে না ঘটে।
কিন্তু তবু স্বপ্ন ওটা করি অনুমান,
যদিও রাজার শিরে পেয়েছিল স্থান।
অর্থ চাই, রাজকোষে আছে ভূরি ভূরি;
রাজস্বপ্নে অর্থ নাই যত মাথা খুঁড়ি।
নাই অর্থ কিন্তু তবু কহি অকপট,
শুনিতে কি মিষ্ট আহা, হিং টিং ছট্।'
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান;
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান॥

শুনিয়া সভাস্থ সবে করে 'ধিক্ ধিক্'—
'কোথাকার গণ্ডমূর্খ পাষণ্ড নাস্তিক!
স্বপ্ন শুধু স্বপ্নমাত্র মস্তিষ্কবিকার,
এ কথা কেমন করে করিব স্বীকার!
জগৎবিখ্যাত মোরা 'ধর্মপ্রাণ' জাতি!
স্বপ্ন উড়াইয়া দিবে! দুপুরে ডাকাতি!'

হবুচন্দ্র রাজা কহে পাকালিয়া চোখ,
‘গবুচন্দ্র, এদের উচিত শিক্ষা হোক।’
হেঁটোয় কণ্টক দাও, উপরে কণ্টক ;
ডালকুত্তাদের মাঝে করহ বণ্টক।’
সতেরো মিনিট কাল না হইতে শেষ
ম্লেচ্ছ পণ্ডিতের আর না মিলে উদ্দেশ।
সভাস্থ সবাই ভাসে আনন্দাশ্রুনীরে,
ধর্মরাজ্যে পুনর্বার শান্তি এল ফিরে।
পণ্ডিতেরা মুখ চক্ষু করিয়া বিকট
পুনর্বার উচ্চারিল ‘হিং টিং ছট্’।
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান ;
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান॥

অতঃপর গৌড় হতে এল হেন বেলা
যবন পণ্ডিতদের গুরু-মারা চেলা।
নগ্নশির, সজ্জা নাই, লজ্জা নাই ধড়ে—
কাছা কোঁচা শতবার খ’সে খ’সে পড়ে।
অস্তিত্ব আছে না আছে, ক্ষীণখর্বদেহ—
বাক্য যবে বাহিরায় না থাকে সন্দেহ।
এতটুকু যন্ত্র হতে এত শব্দ হয়
দেখিয়া বিশ্বের লাগে বিষম বিস্ময়।
না জানে অভিবাদন, না পুছে কুশল—
পিতৃনাম শুধাইলে উদ্যতমুষল।

সগর্বে জিজ্ঞাসা করে, 'কী লয়ে বিচার ?
শুনিলে বলিতে পারি কথা দুই-চার,
ব্যাখ্যায় করিতে পারি উলট-পালট।'
সমস্বরে কহে সবে 'হিং টিং ছট্‌'।
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান ;
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান ॥

স্বপ্নকথা শুনি মুখ গম্ভীর করিয়া
কহিল গৌড়ীয় সাধু প্রহর ধরিয়া,
'নিতান্ত সরল অর্থ, অতি পরিষ্কার ;
বহু পুরাতন ভাব, নব আবিষ্কার।
ত্র্যম্বকের ত্রিনয়ন ত্রিকাল ত্রিগুণ
শক্তিভেদে ব্যক্তিভেদ দ্বিগুণ বিগুণ।
বিবর্তন আবর্তন সম্বর্তন আদি
জীবশক্তি শিবশক্তি করে বিসম্বাদী।
আকর্ষণ বিকর্ষণ পুরুষ প্রকৃতি
আণব চৌম্বক বলে আকৃতি বিকৃতি।
কুশাগ্রে প্রবহমান জীবাত্মবিদ্যুৎ
ধারণা পরমা শক্তি সেথায় উদ্ভূত।
ত্রয়ী শক্তি ত্রিস্বরূপে প্রপঞ্চে প্রকট—
সংক্ষেপে বলিতে গেলে, হিং টিং ছট্‌।
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান ;
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান।

'সাধু সাধু সাধু' রবে কাঁপে চারি ধার;
সবে বলে, 'পরিষ্কার— অতি পরিষ্কার!
দুর্বোধ যা-কিছু ছিল হয়ে গেল জল,
শূন্য আকাশের মতো অত্যন্ত নির্মল।'
হাঁপ ছাড়ি উঠিলেন হবুচন্দ্ররাজ;
আপনার মাথা হতে খুলি লয়ে তাজ
পরাইয়া দিল ক্ষীণ বাঙালির শিরে,
ভারে তার মাথাটুকু পড়ে বুঝি ছিঁড়ে।
বহু দিন পরে আজ চিন্তা গেল ছুটে,
হাবুডুবু হবুরাজ্য নড়িচড়ি উঠে।
ছেলেরা ধরিল খেলা, বৃদ্ধেরা তামুক,
এক দণ্ডে খুলে গেল রমণীর মুখ।
দেশ-জোড়া মাথা-ধরা ছেড়ে গেল চট্,
সবাই বুঝিয়া গেল 'হিং টিং ছট্'।
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান;
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান॥

—

যে শুনিবে এই স্বপ্নমঙ্গলের কথা
সর্বভ্রম ঘুচে যাবে, নহিবে অন্যথা।
বিশ্বে কভু বিশ্ব ভেবে হবে না ঠকিতে,
সত্যেরে সে মিথ্যা বলি বুঝিবে চকিতে

যা আছে তা নাই আর নাই যাহা আছে
এ কথা জাজ্বল্যমান হবে তার কাছে।
সবাই সরলভাবে দেখিবে যা-কিছু
সে আপন লেজুড় জুড়িবে তার পিছু।
এসো ভাই, তোলো হাই, শুয়ে পড়ো চিৎ ;
অনিশ্চিত এ সংসারে এ কথা নিশ্চিত—
জগতে সকলি মিথ্যা, সব মায়াময়,
স্বপ্ন শুধু সত্য আর সত্য কিছু নয়।
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান ;
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান॥

শান্তিনিকেতন
১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

পরশপাথর

খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশপাথর।
মাথায় বৃহৎ জটা ধুলায় কাদায় কটা,
মলিন ছায়ার মতো ক্ষীণ কলেবর।
ওষ্ঠে অধরেতে চাপি অন্তরের দ্বার ঝাঁপি
রাত্রিদিন তীব্র জ্বালা জ্বেলে রাখে চোখে।
দুটো নেত্র সদা যেন নিশার খদ্যোত-হেন
উড়ে উড়ে খোঁজে কারে নিজের আলোকে।
নাহি যার চালচুলা, গায়ে মাখে ছাইধুলা,
কটিতে জড়ানো শুধু ধূসর কৌপীন,
ডেকে কথা কয় তারে কেহ নাই এ সংসারে,
পথের ভিখারী হতে আরো দীনহীন,
তার এত অভিমান, সোনারুপা তুচ্ছজ্ঞান,
রাজসম্পদের লাগি নহে সে কাতর—
দশা দেখে হাসি পায়, আর কিছু নাহি চায়,
একেবারে পেতে চায় পরশপাথর॥

সম্মুখে গরজে সিন্ধু অগাধ অপার।
তরঙ্গে তরঙ্গ উঠি হেসে হল কুটিকুটি
সৃষ্টিছাড়া পাগলের দেখিয়া ব্যাপার।

আকাশ রয়েছে চাহি,　　　　নয়নে নিমেষ নাহি,
হুহু ক'রে সমীরণ ছুটেছে অবাধ।
সূর্য ওঠে প্রাতঃকালে　　　　পূর্বগগনের ভালে,
সন্ধ্যাবেলা ধীরে ধীরে উঠে আসে চাঁদ।
জলরাশি অবিরল　　　　করিতেছে কলকল্‌,
অতল রহস্য যেন চাহে বলিবারে।
কাম্য ধন আছে কোথা　　　　জানে যেন সব কথা,
সে ভাষা যে বোঝে সেই খুঁজে নিতে পারে।
কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নাহি,　　　　মহাগাথা গান গাহি
সমুদ্র আপনি শুনে আপনার স্বর।
কেহ যায়, কেহ আসে,　　　　কেহ কাঁদে, কেহ হাসে—
খ্যাপা তীরে খুঁজে ফিরে পরশপাথর॥

একদিন বহুপূর্বে, আছে ইতিহাস,
নিকষে সোনার রেখা　　　　সবে যেন দিল দেখা—
আকাশে প্রথম সৃষ্টি পাইল প্রকাশ।
মিলি যত সুরাসুর　　　　কৌতূহলে ভরপুর
এসেছিল পা টিপিয়া এই সিন্ধুতীরে—
অতলের পানে চাহি　　　　নয়নে নিমেষ নাহি,
নীরবে দাঁড়ায়ে ছিল স্থির নতশিরে।
বহুকাল স্তব্ধ থাকি　　　　শুনেছিল মুদে আঁখি
এই মহাসমুদ্রের গীতি চিরন্তন—

তার পরে কৌতূহলে ঝাঁপায়ে অগাধ জলে
করেছিল এ অনন্ত রহস্য মন্থন।
বহু কাল দুঃখ সেবি নিরখিল লক্ষ্মীদেবী
উদিলা জগৎমাঝে অতুল সুন্দর।
সেই সমুদ্রের তীরে শীর্ণদেহে জীর্ণচীরে
খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশপাথর॥

এত দিনে বুঝি তার ঘুচে গেছে আশ।
খুঁজে খুঁজে ফিরে তবু, বিশ্রাম না জানে কভু—
আশা গেছে, যায় নাই খোঁজার অভ্যাস।
বিরহী-বিহঙ্গ ডাকে সারা নিশি তরুশাখে,
যারে ডাকে তার দেখা পায় না অভাগা—
তবু ডাকে সারা দিন আশাহীন শ্রান্তিহীন,
একমাত্র কাজ তার ডেকে ডেকে জাগা।
আর-সব কাজ ভুলি আকাশে তরঙ্গ তুলি
সমুদ্র না জানি কারে চাহে অবিরত—
যত করে হায়-হায় কোনো কালে নাহি পায়,
তবু শূন্যে তোলে বাহু ওই তার ব্রত।
কারে চাহি ব্যোমতলে গ্রহতারা লয়ে চলে,
অনন্ত সাধনা করে বিশ্বচরাচর—
সেইমত সিন্ধুতটে ধূলিমাখা দীর্ঘজটে
খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশপাথর॥

একদা শুধালো তারে গ্রামবাসী ছেলে,
'সন্ন্যাসীঠাকুর, একি ! কাঁকালে ও কী ও দেখি,
সোনার শিকল তুমি কোথা হতে পেলে ?'
সন্ন্যাসী চমকি ওঠে, শিকল সোনার বটে ;
লোহা সে হয়েছে সোনা জানে না কখন।
একি কাণ্ড চমৎকার, তুলে দেখে বার বার,
আঁখি কচালিয়া দেখে এ নহে স্বপন।
কপালে হানিয়া কর ব'সে পড়ে ভূমি-'পর,
নিজেরে করিতে চাহে নির্দয় লাঞ্ছনা ;
পাগলের মতো চায়— কোথা গেল, হায় হায়,
ধরা দিয়ে পলাইল সফল বাঞ্ছনা।
কেবল অভ্যাসমত নুড়ি কুড়াইত কত,
ঠন্ করে ঠেকাইত শিকলের 'পর,
চেয়ে দেখিত না, নুড়ি দূরে ফেলে দিত ছুঁড়ি—
কখন ফেলেছে ছুঁড়ে পরশপাথর॥

তখন যেতেছে অস্তে মলিন তপন।
আকাশ সোনার বর্ণ, সমুদ্র গলিত স্বর্ণ,
পশ্চিমদিগ্বধূ দেখে সোনার স্বপন।
সন্ন্যাসী আবার ধীরে পূর্বপথে যায় ফিরে
খুঁজিতে নূতন ক'রে হারানো রতন।

সে শকতি নাহি আর, নুয়ে পড়ে দেহভার,
অন্তর লুটায় ছিন্ন তরুর মতন।
পুরাতন দীর্ঘ পথ পড়ে আছে মৃতবৎ
হেথা হতে কত দূর নাহি তার শেষ।
দিক হতে দিগন্তরে মরুবালি ধূ ধূ করে,
আসন্ন রজনীছায়ে ম্লান সর্বদেশ।
অর্ধেক জীবন খুঁজি কোন্ ক্ষণে চক্ষু বুজি
স্পর্শ লভেছিল যার এক-পল-ভর,
বাকি অর্ধ ভগ্ন প্রাণ আবার করিছে দান
ফিরিয়া খুঁজিতে সেই পরশপাথর॥

শান্তিনিকেতন
১৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

বৈষ্ণবকবিতা

শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান !
পূর্বরাগ, অনুরাগ, মান-অভিমান,
অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহমিলন,
বৃন্দাবনগাথা— এই প্রণয়স্বপন
শ্রাবণের শর্বরীতে কালিন্দীর কূলে,
চারি চক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে
শরমে সম্ভ্রমে, এ কি শুধু দেবতার !
এ সংগীতরসধারা নহে মিটাবার
দীন মর্তবাসী এই নরনারীদের
প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবসের
তপ্ত প্রেমতৃষা !

এ গীত-উৎসব-মাঝে
শুধু তিনি আর ভক্ত নির্জনে বিরাজে ;
দাঁড়ায়ে বাহির-দ্বারে মোরা নরনারী
উৎসুক শ্রবণ পাতি শুনি যদি তারি
দুয়েকটি তান— দূর হতে তাই শুনে
তরুণ বসন্তে যদি নবীন ফাল্গুনে
অন্তর পুলকি উঠে— শুনি সেই সুর
সহসা দেখিতে পাই দ্বিগুণ মধুর
আমাদের ধরা— মধুময় হয়ে উঠে

আমাদের বনচ্ছায়ে যে নদীটি ছুটে,
মোদের কুটিরপ্রান্তে যে কদম্ব ফুটে
বরষার দিনে— সেই প্রেমাতুর তানে
যদি ফিরে চেয়ে দেখি মোর পার্শ্বপানে
ধরি মোর বামবাহু রয়েছে দাঁড়ায়ে
ধরার সঙ্গিনী মোর হৃদয় বাড়ায়ে
মোর দিকে, বহি' নিজ মৌন ভালোবাসা,
ওই গানে যদি-বা সে পায় নিজভাষা,
যদি তার মুখে ফুটে পূর্ণ প্রেমজ্যোতি—
তোমার কি তাঁর বন্ধু, তাহে কার ক্ষতি ?।

সত্য ক'রে কহো মোরে হে বৈষ্ণবকবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহতাপিত। হেরি কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে ?
বিজন বসন্তরাতে মিলনশয়নে
কে তোমারে বেঁধেছিল দুটি বাহুডোরে,
আপনার হৃদয়ের অগাধ সাগরে
রেখেছিল মগ্ন করি ! এত প্রেমকথা
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হতে ! আজ তার নাহি অধিকার

সে সংগীতে! তারি নারীহৃদয়সঞ্চিত
তার ভাষা হতে তারে করিবে বঞ্চিত
চিরদিন!

আমাদেরই কুটিরকাননে
ফুটে পুষ্প, কেহ দেয় দেবতাচরণে,
কেহ রাখে প্রিয়জন-তরে— তাহে তাঁর
নাহি অসন্তোষ। এই প্রেমগীতিহার
গাঁথা হয় নরনারী-মিলনমেলায়,
কেহ দেয় তাঁরে কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি দিই তাই
প্রিয়জনে, প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে— আর পাব কোথা!
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা॥

বৈষ্ণবকবির গাঁথা প্রেম-উপহার
চলিয়াছে নিশিদিন কত ভারে ভার
বৈকুণ্ঠের পথে। মধ্যপথে নরনারী
অক্ষয় সে সুধারাশি করি কাড়াকাড়ি
লইতেছে আপনার প্রিয়গৃহতরে
যথাসাধ্য যে যাহার; যুগে যুগান্তরে
চিরদিন পৃথিবীতে যুবকযুবতী

নরনারী এমনি চঞ্চলমতিগতি।
দুই পক্ষে মিলে একেবারে আত্মহারা
অবোধ অজ্ঞান। সৌন্দর্যের দস্যু তারা
লুটেপুটে নিতে চায় সব। এত গীতি,
এত ছন্দ, এত ভাবে উচ্ছ্বাসিত প্রীতি,
এত মধুরতা দ্বারের সম্মুখ দিয়া
বহে যায়— তাই তারা পড়েছে আসিয়া
সবে মিলি কলরবে সেই সুধাস্রোতে।
সমুদ্রবাহিনী সেই প্রেমধারা হতে
কলস ভরিয়া তারা লয়ে যায় তীরে
বিচার না করি কিছু আপন কুটিরে
আপনার তরে। তুমি মিছে ধর দোষ,
হে সাধু পণ্ডিত, মিছে করিতেছ রোষ।
যাঁর ধন তিনি ওই অপার সন্তোষে
অসীম স্নেহের হাসি হাসিছেন বসে॥

শাহাজাদপুর
১৮ আষাঢ় ১২৯৯

দুই পাখি

খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে,
বনের পাখি ছিল বনে।
একদা কী করিয়া মিলন হল দোঁহে,
কী ছিল বিধাতার মনে!
বনের পাখি বলে, 'খাঁচার পাখি ভাই,
বনেতে যাই দোঁহে মিলে।'
খাঁচার পাখি বলে, 'বনের পাখি, আয়,
খাঁচায় থাকি নিরিবিলে।'
বনের পাখি বলে, 'না,
আমি শিকলে ধরা নাহি দিব।'
খাঁচার পাখি বলে, 'হায়,
আমি কেমনে বনে বাহিরিব!'

বনের পাখি গাহে বাহিরে বসি বসি
বনের গান ছিল যত,
খাঁচার পাখি পড়ে শিখানো বুলি তার—
দোঁহার ভাষা দুইমত।
বনের পাখি বলে, 'খাঁচার পাখি ভাই,
বনের গান গাও দিখি।'
খাঁচার পাখি বলে, 'বনের পাখি ভাই,
খাঁচার গান লহো শিখি।'

বনের পাখি বলে, 'না,
আমি শিখানো গান নাহি চাই।'
খাঁচার পাখি বলে, 'হায়,
আমি কেমনে বনগান গাই!'

বনের পাখি বলে, 'আকাশ ঘননীল,
কোথাও বাধা নাহি তার।'
খাঁচার পাখি বলে, 'খাঁচাটি পরিপাটি
কেমন ঢাকা চারি ধার।'
বনের পাখি বলে, 'আপনা ছাড়ি দাও
মেঘের মাঝে একেবারে।'
খাঁচার পাখি বলে, 'নিরালা সুখকোণে
বাঁধিয়া রাখো আপনারে!'
বনের পাখি বলে, 'না,
সেথা কোথায় উড়িবারে পাই!'
খাঁচার পাখি বলে, 'হায়,
মেঘে কোথায় বসিবার ঠাঁই!'

এমনি দুই পাখি দোঁহারে ভালোবাসে,
তবুও কাছে নাহি পায়।
খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে পরশে মুখে মুখে,
নীরবে চোখে চোখে চায়।

দুজনে কেহ কারে   বুঝিতে নাহি পারে,
বুঝাতে নারে আপনায়।
দুজনে একা একা   ঝাপটি মরে পাখা,
কাতরে কহে, 'কাছে আয়!'
বনের পাখি বলে, 'না,
কবে   খাঁচায় রুধি দিবে দ্বার।'
খাঁচার পাখি বলে, 'হায়,
মোর   শকতি নাহি উড়িবার।'

শাহাজাদপুর
১৯ আষাঢ় ১২৯৯

আকাশের চাঁদ

'হাতে তুলে দাও আকাশের চাঁদ' এই হল তার বুলি।
দিবস রজনী যেতেছে বহিয়া, কাঁদে সে দু হাত তুলি।
হাসিছে আকাশ, বহিছে বাতাস, পাখিরা গাহিছে সুখে।
সকালে রাখাল চলিয়াছে মাঠে, বিকালে ঘরের মুখে।
বালকবালিকা ভাইবোনে মিলে খেলিছে আঙিনাকোণে,
কোলের শিশুরে হেরিয়া জননী হাসিছে আপনমনে।
কেহ হাটে যায়, কেহ বাটে যায়, চলেছে যে যার কাজে—
কত জনরব, কত কলরব উঠিছে আকাশমাঝে।
পথিকেরা এসে তাহারে শুধায়, 'কে তুমি কাঁদিছ বসি!'
সে কেবল বলে নয়নের জলে, 'হাতে পাই নাই শশী।'

সকালে বিকালে ঝরি পড়ে কোলে অযাচিত ফুলদল,
দখিন সমীর বুলায় ললাটে দক্ষিণকরতল।
প্রভাতের আলো আশিস্-পরশ করিছে তাহার দেহে,
রজনী তাহারে বুকের আঁচলে ঢাকিছে নীরব স্নেহে।
কাছে আসি শিশু মাগিছে আদর কণ্ঠ জড়ায়ে ধরি,
পাশে আসি যুবা চাহিছে তাহারে লইতে বন্ধু করি।
এই পথে গৃহে কত আনাগোনা, কত ভালোবাসা-বাসি,
সংসারসুখ কাছে কাছে তার কত আসে-যায় ভাসি।

মুখ ফিরাইয়া সে রহে বসিয়া, কহে সে নয়নজলে,
'তোমাদের আমি চাহি না কারেও, শশী চাই করতলে।'

শশী যেথা ছিল সেথাই রহিল, সেও ব'সে এক ঠাঁই।
অবশেষে যবে জীবনের দিন আর বেশি বাকি নাই
এমন সময়ে সহসা কী ভাবি চাহিল সে মুখ ফিরে—
দেখিল, ধরণী শ্যামল মধুর সুনীলসিন্ধুতীরে।
সোনার ক্ষেত্রে কৃষাণ বসিয়া কাটিতেছে পাকা ধান।
ছোটো ছোটো তরী পাল তুলে যায়, মাঝি বসে গায় গান।
দূরে মন্দিরে বাজিছে কাঁসর, বধূরা চলেছে ঘাটে।
মেঠো পথ দিয়ে গৃহস্থজন আসিছে গ্রামের হাটে।
নিশ্বাস ফেলি রহে আঁখি মেলি, কহে ম্রিয়মাণমন,
'শশী নাহি চাই যদি ফিরে পাই আরবার এ জীবন।'

দেখিল চাহিয়া, জীবনপূর্ণ সুন্দর লোকালয়
প্রতি দিবসের হরষে বিষাদে চিরকল্লোলময়।
স্নেহসুধা লয়ে গৃহের লক্ষ্মী ফিরিছে গৃহের মাঝে,
প্রতি দিবসেরে করিছে মধুর প্রতি দিবসের কাজে।
সকাল বিকাল দুটি ভাই আসে ঘরের ছেলের মতো,
রজনী সবারে কোলেতে লইছে নয়ন করিয়া নত।
ছোটো ছোটো ফুল, ছোটো ছোটো হাসি, ছোটো কথা, ছোটো সুখ,
প্রতি নিমেষের ভালোবাসাগুলি, ছোটো ছোটো হাসিমুখ

আপনা-আপনি উঠিছে ফুটিয়া মানবজীবন ঘিরি—
বিজন শিখরে বসিয়া সে তাই দেখিতেছে ফিরি ফিরি

দেখে, বহু দূরে ছায়াপুরীসম অতীতজীবনরেখা
অস্তরবির সোনার কিরণে নূতন বরনে লেখা।
যাহাদের পানে নয়ন তুলিয়া চাহে নি কখনো ফিরে
নবীন আভায় দেখা দেয় তারা স্মৃতি-সাগরের তীরে।
হতাশ হৃদয়ে কাঁদিয়া কাঁদিয়া পূরবী রাগিণী বাজে;
দু বাহু বাড়ায়ে ফিরে যেতে চায় ওই জীবনের মাঝে।
দিনের আলোক মিলায়ে আসিল, তবু পিছে চেয়ে রহে—
যাহা পেয়েছিল তাই পেতে চায়, তার বেশি কিছু নহে।
সোনার জীবন রহিল পড়িয়া, কোথা সে চলিল ভেসে।
শশীর লাগিয়া কাঁদিতে গেল কি রবিশশীহীন দেশে?

বোট। যমুনায়
বিরাহিমপুরের পথে
২২ আষাঢ় ১২৯৯

গানভঙ্গ

গাহিছে কাশীনাথ নবীন যুবা,   ধ্বনিতে সভাগৃহ ঢাকি
কণ্ঠে খেলিতেছে সাতটি স্থর   সাতটি যেন পোষা পাখি।
শাণিত তরবারি গলাটি যেন   নাচিয়া ফিরে দশ দিকে,
কখন কোথা যায় না পাই দিশা,   বিজুলি-হেন ঝিকিমিকে।
আপনি গড়ি তোলে বিপদজাল,   আপনি কাটি দেয় তাহা।
সভার লোকে শুনে অবাক মানে,   সঘনে বলে বাহা-বাহা॥

কেবল বুড়া রাজা প্রতাপরায়   কাঠের মতো বসি আছে,
বরজলাল ছাড়া কাহারো গান   ভালো না লাগে তার কাছে।
বালক-বেলা হতে তাহারি গীতে   দিল সে এত কাল যাপি—
বাদলদিনে কত মেঘের গান,   হোলির দিনে কত কাফি!
গেয়েছে আগমনী শরৎ-প্রাতে   গেয়েছে বিজয়ার গান—
হৃদয় উছসিয়া অশ্রুজলে   ভাসিয়া গেছে দু'নয়ান।
যখনি মিলিয়াছে বন্ধুজনে   সভার গৃহ গেছে পূরে—
গেয়েছে গোকুলের গোয়াল-গাথা   ভূপালি মুলতানি স্থরে॥

ঘরেতে বারবার এসেছে কত   বিবাহ-উৎসব-রাতি,
পরেছে দাসদাসী লোহিত বাস,   জ্বলেছে শত শত বাতি;
বসেছে নববর সলাজমুখে   পরিয়া মণি-আভরণ,
করিছে পরিহাস কানের কাছে   সমবয়সী প্রিয়জন,

সামনে বসি তার বরজলাল ধরেছে শাহানার সুর—
সে-সব দিন আর সে-সব গান হৃদয়ে আছে পরিপূর।
সে ছাড়া কারো গান শুনিলে তাই মর্মে গিয়ে নাহি লাগে,
অতীত প্রাণ যেন মন্ত্রবলে নিমেষে প্রাণে নাহি জাগে।
প্রতাপরায় তাই দেখিছে শুধু কাশীর বৃথা মাথা-নাড়া ;
সুরের পরে সুর ফিরিয়া যায়, হৃদয়ে নাহি পায় সাড়া ॥

থামিল গান যবে, ক্ষণেকতরে বিরাম মাগে কাশীনাথ,
বরজলাল-পানে প্রতাপরায় হাসিয়া করে আঁখিপাত—
কানের কাছে তার রাখিয়া মুখ কহিল, 'ওস্তাদ জি,
গানের মতো গান শুনায়ে দাও। এরে কি গান বলে, ছি
এ যেন পাখি লয়ে বিবিধ ছলে শিকারি বিড়ালের খেলা।
সেকালে গান ছিল, একালে হায় গানের বড়ো অবহেলা।'

বরজলাল বুড়া শুক্লকেশ, শুভ্র উষ্ণীষ শিরে,
বিনতি করি সবে সভার মাঝে আসন নিল ধীরে ধীরে।
শিরা-বাহির-করা শীর্ণ করে তুলিয়া নিল তানপুর,
ধরিল নতশিরে নয়ন মুদি ইমনকল্যাণ সুর।
কাঁপিয়া ক্ষীণ স্বর মরিয়া যায় বৃহৎ সভাগৃহ-কোণে,
ক্ষুদ্র পাখি যথা ঝড়ের মাঝে উড়িতে নারে প্রাণপণে।
বসিয়া বাম পাশে প্রতাপরায় দিতেছে শত উৎসাহ—
'আহাহা বাহা বাহা' কহিছে কানে, 'গলা ছাড়িয়া গান গাহো।'

সভার লোকে সবে অন্যমনা— কেহ বা কানাকানি করে,
কেহ বা তোলে হাই, কেহ বা ঢোলে, কেহ বা চলে যায় ঘরে।
'ওরে রে আয় লয়ে তামাকু পান' ভৃত্যে ডাকি কেহ কয়।
সঘনে পাখা নাড়ি কেহ বা বলে, 'গরম আজি অতিশয়।'
করিছে আনাগোনা, ব্যস্ত লোক, ক্ষণেক নাহি রহে চুপ—
নীরব ছিল সভা, ক্রমশ সেথা শব্দ উঠে শতরূপ।
বুড়ার গান তাহে ডুবিয়া যায়, তুফানমাঝে ক্ষীণ তরী;
কেবল দেখা যায় তানপুরায় আঙুল কাঁপে থরথরি।
হৃদয়ে যেথা হতে গানের সুর উছসি উঠে নিজসুখে
হেলার কলরব শিলার মতো চাপে সে উৎসের মুখে।
কোথায় গান আর কোথায় প্রাণ, দু দিকে ধায় দুই জনে;
তবুও রাখিবারে প্রভুর মান বরজ গায় প্রাণপণে॥

গানের এক পদ মনের ভ্রমে হারায়ে গেল কী করিয়া—
আবার তাড়াতাড়ি ফিরিয়া গাহে, লইতে চাহে শুধরিয়া।
আবার ভুলে যায়, পড়ে না মনে— শরমে মস্তক নাড়ি
আবার শুরু হতে ধরিল গান, আবার ভুলি দিল ছাড়ি!
দ্বিগুণ থরথরি কাঁপিছে হাত, স্মরণ করে গুরুদেবে।
কণ্ঠ কাঁপিতেছে কাতরে, যেন বাতাসে দীপ নেবে-নেবে।
গানের পদ তবে ছাড়িয়া দিয়া রাখিল সুরটুকু ধরি,
সহসা হাহারবে উঠিল কাঁদি গাহিতে গিয়া হা-হা করি।
কোথায় দূরে গেল সুরের খেলা কোথায় তাল গেল ভাসি,
গানের সুতা ছিঁড়ি পড়িল খসি অশ্রুমুকুতার রাশি।

কোলের সখী তানপুরার 'পরে   রাখিল লজ্জিত মাথা—
ভুলিল শেখা গান, পড়িল মনে   বাল্যক্রন্দনগাথা।
নয়ন ছলছল, প্রতাপরায়   কর বুলায় তার দেহে,
'আইস হেথা হতে আমরা যাই'   কহিল সকরুণ স্নেহে।
শতেক-দীপ-জ্বালা নয়ন-ভরা   ছাড়ি সে উৎসবঘর
বাহিরে গেল দুটি প্রাচীন সখা   ধরিয়া দুঁহু দোঁহা-কর॥

বরজ করজোড়ে কহিল, 'প্রভু,   মোদের সভা হল ভঙ্গ।
এখন আসিয়াছে নূতন লোক,   ধরায় নব নব রঙ্গ।
জগতে আমাদের বিজন সভা,   কেবল তুমি আর আমি।
সেথায় আনিয়ো না নূতন শ্রোতা,   মিনতি তব পদে স্বামী।
একাকী গায়কের নহে তো গান,   মিলিতে হবে দুই জনে।
গাহিবে একজন খুলিয়া গলা   আরেক জন গাবে মনে।
তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ   তবে সে কলতান উঠে,
বাতাসে বনসভা শিহরি কাঁপে   তবে সে মর্মর ফুটে।
জগতে যেথা যত রয়েছে ধ্বনি   যুগল মিলিয়াছে আগে—
যেখানে প্রেম নাই বোবার সভা,   সেখানে গান নাহি জাগে।'

বোট। শিলাইদহ
২৪ আষাঢ় ১২৯৯

যেতে নাহি দিব

দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি; বেলা দ্বিপ্রহর;
হেমন্তের রৌদ্র ক্রমে হতেছে প্রখর,
জনশূন্য পল্লিপথে ধূলি উড়ে যায়
মধ্যাহ্নবাতাসে; স্নিগ্ধ অশথের ছায়
ক্লান্ত বৃদ্ধা ভিখারিনী জীর্ণ বস্ত্র পাতি
ঘুমায়ে পড়েছে; যেন রৌদ্রময়ী রাতি
ঝাঁ ঝাঁ করে চারি দিকে নিস্তব্ধ নিঃঝুম—
শুধু মোর ঘরে নাহি বিশ্রামের ঘুম ॥

গিয়েছে আশ্বিন; পূজার ছুটির শেষে
ফিরে যেতে হবে আজি বহুদূর দেশে
সেই কর্মস্থানে। ভৃত্যগণ ব্যস্ত হয়ে
বাঁধিছে জিনিসপত্র দড়াদড়ি লয়ে;
হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি এ ঘরে, ও ঘরে।
ঘরের গৃহিণী, চক্ষু ছলছল করে,
ব্যথিছে বক্ষের কাছে পাষাণের ভার,
তবুও সময় তার নাহি কাঁদিবার
একদণ্ডতরে; বিদায়ের আয়োজনে
ব্যস্ত হয়ে ফিরে, যথেষ্ট না হয় মনে
যত বাড়ে বোঝা। আমি বলি, 'এ কী কাণ্ড।
এত ঘট, এত পট, হাঁড়ি সরা ভাণ্ড,

বোতল বিছানা বাক্স, রাজ্যের বোঝাই
কী করিব লয়ে ? কিছু এর রেখে যাই,
কিছু লই সাথে।'

সে কথায় কর্ণপাত
নাহি করে কোনোজন। 'কী জানি দৈবাৎ
এটা ওটা আবশ্যক যদি হয় শেষে
তখন কোথায় পাবে বিভুঁই বিদেশে ?—
সোনামুগ সরু-চাল সুপারি ও পান,
ও হাঁড়িতে ঢাকা আছে দুই-চারিখান
গুড়ের পাটালি, কিছু ঝুনা নারিকেল,
দুইভাণ্ড ভালো রাই-সরিষার তেল,
আমসত্ত্ব আমচুর, সের-দুই দুধ—
এই-সব শিশি কৌটা ওষুধ-বিষুধ।
মিষ্টান্ন রহিল কিছু হাঁড়ির ভিতরে—
মাথা খাও, ভুলিয়ো না খেয়ো মনে করে।'
বুঝিনু যুক্তির কথা বৃথা বাক্যব্যয়।
বোঝাই হইল উঁচু পর্বতের ন্যায়।
তাকানু ঘড়ির পানে, তার পরে ফিরে
চাহিনু প্রিয়ার মুখে ; কহিলাম ধীরে,
'তবে আসি।' অমনি ফিরায়ে মুখখানি
নতশিরে চক্ষু-'পরে বস্ত্রাঞ্চল টানি
অমঙ্গল-অশ্রুজল করিল গোপন ॥

বাহিরে দ্বারের কাছে বসি অন্যমন
কন্যা মোর চারি বছরের। এতক্ষণ
অন্য দিনে হয়ে যেত স্নানসমাপন ;
দুটি অন্ন মুখে না তুলিতে আঁখিপাতা
মুদিয়া আসিত ঘুমে ; আজি তার মাতা
দেখে নাই তারে, এত বেলা হয়ে যায়
নাই স্নানাহার। এতক্ষণ ছায়াপ্রায়
ফিরিতেছিল সে মোর কাছে কাছে ঘেঁষে ;
চাহিয়া দেখিতেছিল মৌন নির্নিমেষে
বিদায়ের আয়োজন। শ্রান্তদেহে এবে
বাহিরের দ্বারপ্রান্তে কী জানি কী ভেবে
চুপিচাপি বসে ছিল। কহিনু যখন
'মা গো, আসি' সে কহিল বিষণ্ণনয়ন
ম্লানমুখে, 'যেতে আমি দিব না তোমায়।'
যেখানে আছিল বসে রহিল সেথায় ;
ধরিল না বাহু মোর, রুধিল না দ্বার ;
শুধু নিজহৃদয়ের স্নেহ-অধিকার
প্রচারিল, 'যেতে আমি দিব না তোমায়।'
তবুও সময় হল শেষ ; তবু হায়
যেতে দিতে হল ॥

ওরে মোর মূঢ় মেয়ে,
কে রে তুই, কোথা হতে কী শকতি পেয়ে
কহিলি এমন কথা এত স্পর্ধাভরে

'যেতে আমি দিব না তোমায়'? চরাচরে
কাহারে রাখিবি ধরে দুটি ছোটো হাতে
গরবিনী, সংগ্রাম করিবি কার সাথে
বসি গৃহদ্বারপ্রান্তে শ্রান্তক্ষুদ্রদেহ
শুধু লয়ে ওইটুকু বুক-ভরা স্নেহ!
ব্যথিত হৃদয় হতে বহু ভয়ে লাজে
মর্মের প্রার্থনা শুধু ব্যক্ত করা সাজে
এ জগতে, শুধ্ বলে রাখা 'যেতে দিতে
ইচ্ছা নাহি'। হেন কথা কে পারে বলিতে
'যেতে নাহি দিব'! শুনি তোর শিশুমুখে
স্নেহের প্রবল গর্ববাণী, সকৌতুকে
হাসিয়া সংসার টেনে নিয়ে গেল মোরে;
তুই শুধু পরাভূত চোখে জল ভ'রে
দুয়ারে রহিলি বসে ছবির মতন—
আমি দেখে চলে এনু মুছিয়া নয়ন॥

চলিতে চলিতে পথে হেরি দুই ধারে
শরতের শস্যক্ষেত্র নত শস্যভারে
রৌদ্র পোহাইছে। তরুশ্রেণী উদাসীন
রাজপথপাশে, চেয়ে আছে সারা দিন
আপন ছায়ার পানে। বহে খরবেগ
শরতের ভরা গঙ্গা। শুভ্র খণ্ডমেঘ
মাতৃদুগ্ধপরিতৃপ্ত সুখনিদ্রারত
সদ্যোজাত সুকুমার গোবৎসের মতো

নীলাম্বরে শুয়ে। দীপ্ত রৌদ্রে অনাবৃত
যুগযুগান্তরক্লান্ত দিগন্তবিস্তৃত
ধরণীর পানে চেয়ে ফেলিনু নিশ্বাস ॥

কী গভীর দুঃখে মগ্ন সমস্ত আকাশ,
সমস্ত পৃথিবী! চলিতেছি যত দূর
শুনিতেছি একমাত্র মর্মান্তিক স্বর
'যেতে আমি দিব না তোমায়'। ধরণীর
প্রান্ত হতে নীলাভ্রের সর্বপ্রান্ততীর
ধ্বনিতেছে চিরকাল অনাদ্যন্ত রবে—
'যেতে নাহি দিব। যেতে নাহি দিব।' সবে
কহে 'যেতে নাহি দিব'। তৃণ ক্ষুদ্র অতি
তারেও বাঁধিয়া বক্ষে মাতা বসুমতী
কহিছেন প্রাণপণে 'যেতে নাহি দিব'।
আয়ুক্ষীণদীপমুখে শিখা নিব-নিব,
আঁধারের গ্রাস হতে কে টানিছে তারে—
কহিতেছে শত বার 'যেতে দিব না রে'।
এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত ছেয়ে
সব চেয়ে পুরাতন কথা, সব চেয়ে
গভীর ক্রন্দন— 'যেতে নাহি দিব'। হায়,
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।
চলিতেছে এমনি অনাদি কাল হতে!
প্রলয়সমুদ্রবাহী সৃজনের স্রোতে

প্রসারিতব্যগ্রবাহু জলন্ত-আঁখিতে
'দিব না দিব না যেতে' ডাকিতে ডাকিতে
হুহু করে তীব্রবেগে চলে যায় সবে
পূর্ণ করি বিশ্বতট আর্ত কলরবে।
সম্মুখ-ঊর্মিরে ডাকে পশ্চাতের ঢেউ
'দিব না দিব না যেতে'— নাহি শুনে কেউ,
নাহি কোনো সাড়া॥

চারি দিক হতে আজি
অবিশ্রাম কর্ণে মোর উঠিতেছে বাজি
সেই বিশ্বমর্মভেদী করুণ ক্রন্দন
মোর কন্যা-কণ্ঠস্বরে। শিশুর মতন
বিশ্বের অবোধ বাণী। চিরকাল ধ'রে
যাহা পায় তাই সে হারায়, তবু তো রে
শিথিল হল না মুষ্টি ; তবু অবিরত
সেই চারি বৎসরের কন্যাটির মতো
অক্ষুণ্ণ প্রেমের গর্বে কহিছে সে ডাকি
'যেতে নাহি দিব'। ম্লানমুখ, অশ্রু-আঁখি,
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে টুটিছে গরব,
তবু প্রেম কিছুতে না মানে পরাভব ;
তবু বিদ্রোহের ভাবে রুদ্ধকণ্ঠে কয়
'যেতে নাহি দিব'। যত বার পরাজয়
তত বার কহে, 'আমি ভালোবাসি যারে

সে কি কভু আমা হতে দূরে যেতে পারে !
আমার আকাঙ্ক্ষা-সম এমন আকুল,
এমন সকল-বাড়া, এমন অকূল,
এমন প্রবল, বিশ্বে কিছু আছে আর !'
এত বলি দর্পভরে করে সে প্রচার
'যেতে নাহি দিব'। তখনি দেখিতে পায়
শুষ্ক তুচ্ছ ধূলি-সম উড়ে চলে যায়
একটি নিশ্বাসে তার আদরের ধন ;
অশ্রুজলে ভেসে যায় দুইটি নয়ন,
ছিন্নমূল তরু-সম পড়ে পৃথ্বীতলে
হতগর্ব নতশির। তবু প্রেম বলে,
'সত্যভঙ্গ হবে না বিধির। আমি তাঁর
পেয়েছি স্বাক্ষর-দেওয়া মহা অঙ্গীকার
চির-অধিকার-লিপি।'— তাই স্ফীতবুকে
সর্বশক্তি মরণের মুখের সম্মুখে
দাঁড়াইয়া, সুকুমার ক্ষীণ তনুলতা,
বলে, 'মৃত্যু, তুমি নাই।'— হেন গর্বকথা !
মৃত্যু হাসে বসি। মরণপীড়িত সেই
চিরজীবী প্রেম আচ্ছন্ন করেছে এই
অনন্ত সংসার, বিষণ্ন নয়ন-'পরে
অশ্রুবাষ্পসম, ব্যাকুল আশঙ্কা-ভরে
চিরকম্পমান। আশাহীন শ্রান্ত আশা
টানিয়া রেখেছে এক বিষাদকুয়াশা
বিশ্বময়। আজি যেন পড়িছে নয়নে—

দুখানি অবোধ বাহু বিফল বাঁধনে
জড়ায়ে পড়িয়া আছে নিখিলেরে ঘিরে
স্তব্ধ সকাতর। চঞ্চল স্রোতের নীরে
পড়ে আছে একখানি অচঞ্চল ছায়া—
অশ্রুবৃষ্টিভরা কোন্ মেঘের সে মায়া॥

তাই আজি শুনিতেছি তরুর মর্মরে
এত ব্যাকুলতা; অলস ঔদাস্যভরে
মধ্যাহ্নের তপ্ত বায়ু মিছে খেলা করে
শুষ্ক পত্র লয়ে; বেলা ধীরে যায় চলে
ছায়া দীর্ঘতর করি অশথের তলে।
মেঠো সুরে কাঁদে যেন অনন্তের বাঁশি
বিশ্বের প্রান্তর-মাঝে; শুনিয়া উদাসী
বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলো চুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া; স্থির নয়নযুগল
দূর নীলাম্বরে মগ্ন; মুখে নাহি বাণী—
দেখিলাম তাঁর সেই ম্লান মুখখানি—
সেই দ্বারপ্রান্তে লীন, স্তব্ধ, মর্মাহত,
মোর চারি বৎসরের কন্যাটির মতো॥

জোড়াসাঁকো। কলিকাতা
১৪ কার্তিক ১২৯৯

সমুদ্রের প্রতি

পুরীতে সমুদ্র দেখিয়া

হে আদিজননী সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার,
একমাত্র কন্যা তব কোলে। তাই তন্দ্রা নাহি আর
চক্ষে তব, তাই বক্ষ জুড়ি সদা শঙ্কা, সদা আশা,
সদা আন্দোলন; তাই উঠে বেদমন্ত্রসম ভাষা
নিরন্তর প্রশান্ত অম্বরে, মহেন্দ্রমন্দিরপানে
অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা, নিয়ত মঙ্গলগানে
ধ্বনিত করিয়া দিশি দিশি; তাই ঘুমন্ত পৃথ্বীরে
অসংখ্য চুম্বন কর আলিঙ্গনে সর্ব অঙ্গ ঘিরে,
তরঙ্গবন্ধনে বাঁধি, নীলাম্বর-অঞ্চলে তোমার
সযত্নে বেষ্টিয়া ধরি সন্তর্পণে দেহখানি তার
সুকোমল সুকৌশলে। এ কী সুগম্ভীর স্নেহখেলা
অম্বুনিধি— ছল করি দেখাইয়া মিথ্যা অবহেলা
ধীরি ধীরি পা টিপিয়া পিছু হটি চলি যাও দূরে,
যেন ছেড়ে যেতে চাও; আবার আনন্দপূর্ণ সুরে
উল্লসি ফিরিয়া আসি কল্লোলে ঝাঁপায়ে পড় বুকে—
রাশি রাশি শুভ্রহাস্যে, অশ্রুজলে, স্নেহগর্বসুখে
আর্দ্র করি দিয়ে যাও ধরিত্রীর নির্মল ললাট
আশীর্বাদে। নিত্যবিগলিত তব অন্তর বিরাট,
আদি অন্ত স্নেহরাশি— আদি অন্ত তাহার কোথা রে!
কোথা তার তল! কোথা কূল! বলো কে বুঝিতে পারে

তাহার অগাধ শান্তি, তাহার অপার ব্যাকুলতা,
তার সুগভীর মৌন, তার সমুচ্ছল কলকথা,
তার হাস্য, তার অশ্রুরাশি !— কখনো-বা আপনারে
রাখিতে পার না যেন, স্নেহপূর্ণস্ফীতস্তনভারে
উন্মাদিনী ছুটে এসে ধরণীরে বক্ষে ধর চাপি
নির্দয় আবেগে ; ধরা প্রচণ্ড পীড়নে উঠে কাঁপি
রুদ্ধশ্বাসে উর্ধ্বশ্বাসে চীৎকারি উঠিতে চাহে কাঁদি ;
উন্মত্ত স্নেহক্ষুধায় রাক্ষসীর মতো তারে বাঁধি
পীড়িয়া নাড়িয়া যেন টুটিয়া ফেলিয়া একেবারে
অসীম অতৃপ্তি-মাঝে গ্রাসিতে নাশিতে চাহ তারে
প্রকাণ্ড প্রলয়ে। পরক্ষণে মহা-অপরাধী-প্রায়
পড়ে থাক তটতলে স্তব্ধ হয়ে বিষণ্ণ ব্যথায়
নিষণ্ণ নিশ্চল— ধীরে ধীরে প্রভাত উঠিয়া এসে
শান্তদৃষ্টি চাহে তোমাপানে ; সন্ধ্যাসখী ভালোবেসে
স্নেহকরস্পর্শ দিয়ে সান্ত্বনা করিয়ে চুপে চুপে
চলে যায় তিমিরমন্দিরে ; রাত্রি শোনে বন্ধুরূপে
গুমরি ক্রন্দন তব রুদ্ধ অনুতাপে ফুলে ফুলে ॥

আমি পৃথিবীর শিশু বসে আছি তব উপকূলে ;
শুনিতেছি ধ্বনি তব। ভাবিতেছি বুঝা যায় যেন
কিছু কিছু মর্ম তার, বোবার ইঙ্গিতভাষা-হেন
আত্মীয়ের কাছে। মনে হয় অন্তরের মাঝখানে
নাড়ীতে যে রক্ত বহে সেও যেন ওই ভাষা জানে—

আর কিছু শেখে নাই। মনে হয়, যেন মনে পড়ে
যখন বিলীনভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে
অজাত ভুবনভ্রূণ-মাঝে, লক্ষকোটি বর্ষ ধ'রে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে ; সেই জন্মপূর্বের স্মরণ,
গর্ভস্থ পৃথিবী-'পরে সেই নিত্য জীবনস্পন্দন
তব মাতৃহৃদয়ের, অতি ক্ষীণ আভাসের মতো
জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি নত
বসি জনশূন্য তীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি।
দিক্ হতে দিগন্তরে যুগ হতে যুগান্তর গণি
তখন আছিলে তুমি একাকিনী অখণ্ড অকূল
আত্মহারা, প্রথম গর্ভের মহারহস্য বিপুল
না বুঝিয়া। দিবারাত্রি গূঢ় এক স্নেহব্যাকুলতা,
গর্ভিণীর পূর্বরাগ, অলক্ষিতে অপূর্ব মমতা,
অজ্ঞাত আকাঙ্ক্ষারাশি, নিঃসন্তান শূন্য বক্ষোদেশে
নিরন্তর উঠিত ব্যাকুলি। প্রতি প্রাতে উষা এসে
অনুমান করি যেত মহাসন্তানের জন্মদিন,
নক্ষত্র রহিত চাহি নিশি নিশি নিমেষবিহীন
শিশুহীন শয়নশিয়রে। সেই আদিজননীর
জনশূন্য জীবশূন্য স্নেহচঞ্চলতা সুগভীর,
আসন্নপ্রতীক্ষাপূর্ণ সেই তব জাগ্রত বাসনা,
অগাধ প্রাণের তলে সেই তব অজানা বেদনা
অনাগত মহাভবিষ্যৎ-লাগি, হৃদয়ে আমার
যুগান্তরস্মৃতিসম উদিত হতেছে বারম্বার॥

আমারো চিত্তের মাঝে তেমনি অজ্ঞাত ব্যথা-ভরে,
তেমনি অচেনা প্রত্যাশায়, অলক্ষ্য সুদূর-তরে
উঠিছে মর্মরস্বর। মানবহৃদয়সিন্ধুতলে
যেন নব মহাদেশ সৃজন হতেছে পলে পলে,
আপনি সে নাহি জানে। শুধু অর্ধ-অনুভব তারি
ব্যাকুল করেছে তারে ; মনে তার দিয়েছে সঞ্চারি
আকারপ্রকারহীন তৃপ্তিহীন এক মহা আশা—
প্রমাণের অগোচর, প্রত্যক্ষের বাহিরেতে বাসা।
তর্ক তারে পরিহাসে, মর্ম তারে সত্য বলি জানে,
সহস্র ব্যাঘাত-মাঝে তবুও সে সন্দেহ না মানে—
জননী যেমন জানে জঠরের গোপন শিশুরে,
প্রাণে যবে স্নেহ জাগে, স্তনে যবে দুগ্ধ উঠে পূরে।
প্রাণ-ভরা ভাষাহরা দিশাহারা সেই আশা নিয়ে
চেয়ে আছি তোমাপানে ; তুমি সিন্ধু, প্রকাণ্ড হাসিয়ে
টানিয়া নিতেছ যেন মহাবেগে কী নাড়ীর টানে
আমার এ মর্মখানি তোমার তরঙ্গ-মাঝখানে
কোলের শিশুর মতো॥

হে জলধি, বুঝিবে কি তুমি
আমার মানবভাষা ? জান কি তোমার ধরাভূমি
পীড়ায় পীড়িত আজি ফিরিতেছে এ পাশ - ও পাশ—
চক্ষে বহে অশ্রুধারা, ঘন ঘন বহে উষ্ণ শ্বাস।
নাহি জানে কী যে চায়, নাহি জানে কিসে ঘুচে তৃষা—

আপনার মনোমাঝে আপনি সে হারায়েছে দিশা
বিকারের মরীচিকাজালে। অতল গম্ভীর তব
অন্তর হইতে কহো সান্ত্বনার বাক্য অভিনব
আষাঢ়ের জলদমন্দ্রের মতো ; স্নিগ্ধ মাতৃপাণি
চিন্তাতপ্ত ভালে তার তালে তালে বারম্বার হানি
সর্বাঙ্গে সহস্রবার দিয়া তারে স্নেহময় চুমা
বলো তারে, 'শান্তি ! শান্তি !' বলো তারে, 'ঘুমা, ঘুমা, ঘুমা !'

রামপুর বোয়ালিয়া
১৭ চৈত্র ১২৯৯

প্রতীক্ষা

ওরে মৃত্যু, জানি তুই আমার বক্ষের মাঝে
বেঁধেছিস বাসা।
যেখানে নির্জন কুঞ্জে ফুটে আছে যত মোর
স্নেহ-ভালোবাসা,
গোপন মনের আশা, জীবনের দুঃখ সুখ,
মর্ম্মের বেদনা,
চিরদিবসের যত হাসি-অশ্রু-চিহ্ন-আঁকা
বাসনা-সাধনা—
যেখানে নন্দনছায়ে নিঃশঙ্কে করিছে খেলা
অন্তরের ধন,
স্নেহের পুত্তলিগুলি, আজন্মের স্নেহস্মৃতি
আনন্দকিরণ—
কত আলো, কত ছায়া, কত ক্ষুদ্র বিহঙ্গের
গীতিময়ী ভাষা—
ওরে মৃত্যু, জানিয়াছি তারি মাঝখানে এসে
বেঁধেছিস বাসা॥

নিশিদিন নিরন্তর জগৎ জুড়িয়া খেলা,
জীবন চঞ্চল।
চেয়ে দেখি, রাজপথে চলেছে অশ্রান্তগতি
যত পান্থদল—

রৌদ্রপাণ্ডু নীলাম্বরে পাখিগুলি উড়ে যায়
প্রাণপূর্ণ বেগে,
সমীরকম্পিত বনে নিশিশেষে নব নব
পুষ্প উঠে জেগে—
চারি দিকে কত শত দেখাশোনা আনাগোনা
প্রভাতে সন্ধ্যায়,
দিনগুলি প্রতি প্রাতে খুলিতেছে জীবনের
নূতন অধ্যায়—
তুমি শুধু এক প্রান্তে বসে আছ অহর্নিশি
স্তব্ধ নেত্র খুলি,
মাঝে মাঝে রাত্রিবেলা উঠ পক্ষ ঝাপটিয়া—
বক্ষ উঠে দুলি ॥

যে সুদূর সমুদ্রের পরপার-রাজ্য হতে
আসিয়াছ হেথা,
এনেছ কি সেথাকার নূতন সংবাদ কিছু,
গোপন বারতা।
সেথা শব্দহীন তীরে ঊর্মিগুলি তালে তালে
মহামন্দ্রে বাজে,
সেই ধ্বনি কী করিয়া ধ্বনিয়া তুলিছ মোর
ক্ষুদ্র বক্ষোমাঝে!
রাত্রিদিন ধুক্ ধুক্ হৃদয়পঞ্জরতটে
অনন্তের ঢেউ

অবিশ্রাম বাজিতেছে সুগম্ভীর সমতানে,
শুনিছে না কেউ।
আমার এ হৃদয়ের ছোটোখাটো গীতগুলি,
স্নেহকলরব,
তারি মাঝে কে আনিল দিশাহীন সমুদ্রের
সংগীত ভৈরব॥

তুই কি বাসিস ভালো আমার এ বক্ষোবাসী
পরানপক্ষীরে,
তাই এর পার্শ্বে এসে কাছে বসেছিস ঘেঁষে
অতি ধীরে ধীরে!
দিনরাত্রি নির্নিমেষে চাহিয়া নেত্রের পানে
নীরব সাধনা,
নিস্তব্ধ আসনে বসি একাগ্র আগ্রহভরে
রুদ্র আরাধনা।
চপল চঞ্চল প্রিয়া ধরা নাহি দিতে চায়,
স্থির নাহি থাকে,
মেলি নানাবর্ণ পাখা উড়ে উড়ে চলে যায়
নব নব শাখে—
তুই তবু একমনে মৌনব্রত একাসনে
বসি নিরলস—
ক্রমে সে পড়িবে ধরা, গীত বন্ধ হয়ে যাবে,
মানিবে সে বশ॥

তখন কোথায় তারে ভুলায়ে লইয়া যাবি
কোন্ শূন্যপথে—
অচৈতন্য প্রেয়সীরে অবহেলে লয়ে কোলে
অন্ধকার রথে!
যেথায় অনাদি রাত্রি রয়েছে চিরকুমারী—
আলোকপরশ
একটি রোমাঞ্চরেখা আঁকে নি তাহার গাত্রে
অসংখ্য বরষ,
সৃজনের পরপ্রান্তে যে অনন্ত অন্তঃপুরে
কভু দৈববশে
দূরতম জ্যোতিষ্কের ক্ষীণতম পদধ্বনি
তিল নাহি পশে,
সেথায় বিরাট পক্ষ দিবি তুই বিস্তারিয়া
বন্ধনবিহীন—
কাঁপিবে বক্ষের কাছে নবপরিণীতা বধূ
নূতন স্বাধীন॥

ক্রমে সে কি ভুলে যাবে ধরণীর নীড়খানি
তৃণে পত্রে গাঁথা—
এ আনন্দ-সূর্যালোক, এই স্নেহ, এই গেহ,
এই পুষ্পপাতা?
ক্রমে সে প্রণয়ভরে তোরেও কি করি লবে
আত্মীয়স্বজন—

অন্ধকার বাসরেতে হবে কি দুজনে মিলি
মৌন-আলাপন !
তোর স্নিগ্ধ সুগম্ভীর অচঞ্চল প্রেমমূর্তি,
অসীম নির্ভর,
নির্নিমেষ নীল নেত্র, বিশ্বব্যাপ্ত জটাজূট,
নির্বাক্‌ অধর,
তার কাছে পৃথিবীর চঞ্চল আনন্দগুলি
তুচ্ছ মনে হবে—
সমুদ্রে মিশিলে নদী, বিচিত্র তটের স্মৃতি
স্মরণে কি রবে ?।

ওগো মৃত্যু, ওগো প্রিয়, তবু থাক্‌ কিছু কাল
ভুবনমাঝারে—
এরই মাঝে বধূবেশে অনন্তবাসর-দেশে
লইয়ো না তারে।
এখনো সকল গান করে নি সে সমাপন
সন্ধ্যায় প্রভাতে,
নিজের বক্ষের তাপে মধুর উত্তপ্ত নীড়ে
সুপ্ত আছে রাতে।
পান্থপাখিদের সাথে এখনো যে যেতে হবে
নব নব দেশে
সিন্ধুতীরে কুঞ্জবনে নব নব বসন্তের
আনন্দ-উদ্দেশে।

ওগো মৃত্যু, কেন তুই এখনি তাহার নীড়ে
বসেছিস্ এসে ?
তার সব ভালোবাসা আঁধার করিতে চাস
তুই ভালোবেসে ?।

এ যদি সত্যই হয় মৃত্তিকার পৃথ্বী-'পরে
মুহূর্তের খেলা—
এই-সব মুখোমুখি এই-সব দেখাশোনা
ক্ষণিকের মেলা,
প্রাণপণ ভালোবাসা সেও যদি হয় শুধু
মিথ্যার বন্ধন,
পরশে খসিয়া পড়ে, তার পরে দণ্ড-দুই
অরণ্যে ক্রন্দন—
তুমি শুধু চিরস্থায়ী, তুমি শুধু সীমাশূন্য
মহাপরিণাম,
যত আশা যত প্রেম তোমার তিমিরে লভে
অনন্ত বিশ্রাম—
তবে, মৃত্যু, দূরে যাও, এখনি দিয়ো না ভেঙে
এ খেলার পুরী—
ক্ষণেক বিলম্ব করো, আমার দু দিন হতে
করিয়ো না চুরি ॥

একদা নামিবে সন্ধ্যা, বাজিবে আরতিশঙ্খ
অদূর মন্দিরে,
বিহঙ্গ নীরব হবে, উঠিবে ঝিল্লির ধ্বনি
অরণ্যগভীরে,
সমাপ্ত হইবে কর্ম, সংসারসংগ্রাম-শেষে
জয়পরাজয়,
আসিবে তন্দ্রার ঘোর পান্থের নয়ন-'পরে
ক্লান্ত অতিশয়,
দিনান্তের শেষ আলো দিগন্তে মিলায়ে যাবে,
ধরণী আঁধার,
সুদূরে জ্বলিবে শুধু অনন্তের যাত্রাপথে
প্রদীপ তারার,
শিয়রে শয়নশেষে বসি যারা অনিমেষে
তাহাদের চোখে
আসিবে শ্রান্তির ভার নিদ্রাহীন যামিনীতে
স্তিমিত আলোকে—

একে একে চলে যাবে আপন আলয়ে সবে
সখাতে সখীতে,
তৈলহীন দীপশিখা নিবিয়া আসিবে ক্রমে
অর্ধরজনীতে,
উচ্ছ্বসিত সমীরণ আনিবে সুগন্ধ বহি
অদৃশ্য ফুলের,

অন্ধকার পূর্ণ করি আসিবে তরঙ্গধ্বনি
অজ্ঞাত কূলের—
ওগো মৃত্যু, সেই লগ্নে নির্জন শয়নপ্রান্তে
এসো বরবেশে।
আমার পরানবধূ ক্লান্ত হস্ত প্রসারিয়া
বহু ভালোবেসে
ধরিবে তোমার বাহু, তখন তাহারে তুমি
মন্ত্র পড়ি নিয়ো,
রক্তিম অধর তার নিবিড় চুম্বনদানে
পাণ্ডু করি দিয়ো॥

ক্রমিক রচনা :
রামপুর বোয়ালিয়া - নাটোর - শিলাইদহ
১৬ - ২০ - ২১ অগ্রহায়ণ ১২৯৯

মানসসুন্দরী

আজ কোনো কাজ নয়— সব ফেলে দিয়ে
ছন্দোবন্ধ গ্রন্থ গীত, এসো তুমি প্রিয়ে,
আজন্মসাধনধন সুন্দরী আমার
কবিতা, কল্পনালতা। শুধু একবার
কাছে বোসো। আজ শুধু কূজন গুঞ্জন
তোমাতে আমাতে ; শুধু নীরবে ভুঞ্জন
এই সন্ধ্যাকিরণের সুবর্ণমদিরা—
যতক্ষণ অন্তরের শিরা উপশিরা
লাবণ্যপ্রবাহভরে ভরি নাহি উঠে,
যতক্ষণে মহানন্দে নাহি যায় টুটে
চেতনাবেদনাবন্ধ, ভুলে যাই সব—
কী আশা মেটে নি প্রাণে, কী সংগীতরব
গিয়েছে নীরব হয়ে, কী আনন্দসুধা
অধরের প্রান্তে এসে অন্তরের ক্ষুধা
না মিটায়ে গিয়াছে শুকায়ে। এই শান্তি,
এই মধুরতা, দিক সৌম্য ম্লান কান্তি
জীবনের দুঃখদৈন্য-অতৃপ্তির 'পর
করুণকোমল আভা গভীর সুন্দর॥

বীণা ফেলে দিয়ে এসো মানসসুন্দরী—
শুধু দুটি রিক্ত হস্ত আলিঙ্গনে ভরি

কণ্ঠে জড়াইয়া দাও— মৃণালপরশে
রোমাঞ্চ অঙ্কুরি উঠে মর্মান্ত হরষে,
কম্পিত চঞ্চল বক্ষ, চক্ষু ছলছল্,
মুগ্ধ তনু মরি যায়, অন্তর কেবল
অঙ্গের সীমান্তপ্রান্তে উদ্ভাসিয়া উঠে,
এখনি ইন্দ্রিয়বন্ধ বুঝি টুটে-টুটে।
অর্ধেক অঞ্চল পাতি বসাও যতনে
পার্শ্বে তব ; সুমধুর প্রিয়সম্বোধনে
ডাকো মোরে, বলো 'প্রিয়', বলো 'প্রিয়তম'—
কুন্তল-আকুল মুখ বক্ষে রাখি মম
হৃদয়ের কানে কানে অতি মৃদু ভাষে
সংগোপনে বলে যাও যাহা মুখে আসে
অর্থহারা ভাবে-ভরা ভাষা। অয়ি প্রিয়া,
চুম্বন মাগিব যবে, ঈষৎ হাসিয়া
বাঁকায়ো না গ্রীবাখানি, ফিরায়ো না মুখ ;
উজ্জ্বল রক্তিমবর্ণ সুধাপূর্ণ সুখ
রেখো ওষ্ঠাধরপুটে, ভক্তভৃঙ্গ-তরে
সম্পূর্ণ চুম্বন এক, হাসিস্তরে-স্তরে
সরস সুন্দর ; নবস্ফুট পুষ্প-সম
হেলায়ে বঙ্কিম গ্রীবা বৃন্ত নিরুপম
মুখখানি তুলে ধোরো ; আনন্দ-আভায়
বড়ো বড়ো দুটি চক্ষু পল্লবপ্রচ্ছায়
রেখো মোর মুখপানে প্রশান্ত বিশ্বাসে,
নিতান্ত নির্ভরে। যদি চোখে জল আসে

কাঁদিব দুজনে ; যদি ললিত কপোলে
মৃদু হাসি ভাসি উঠে, বসি মোর কোলে,
বক্ষ বাঁধি বাহুপাশে, স্কন্ধে মুখ রাখি
হাসিয়ো নীরবে অর্ধনিমীলিত-আঁখি।
যদি কথা পড়ে মনে তবে কলস্বরে
বলে যেয়ো কথা, তরল আনন্দভরে
নির্ঝরের মতো, অর্ধেক রজনী ধরি
কত-না কাহিনী স্মৃতি কল্পনালহরী—
মধুমাখা কণ্ঠের কাকলি। যদি গান
ভালো লাগে, গেয়ো গান। যদি মুগ্ধপ্রাণ
নিঃশব্দ নিস্তব্ধ শান্ত সম্মুখে চাহিয়া
বসিয়া থাকিতে চাও, তাই রব প্রিয়া।
হেরিব অদূরে পদ্মা, উচ্চতটতলে
শ্রান্ত রূপসীর মতো বিস্তীর্ণ অঞ্চলে
প্রসারিয়া তনুখানি, সায়াহ্ন-আলোকে
শুয়ে আছে ; অন্ধকার নেমে আসে চোখে
চোখের পাতার মতো ; সন্ধ্যাতারা ধীরে
সন্তর্পণে করে পদার্পণ নদীতীরে
অরণ্যশিয়রে ; যামিনী শয়ন তার
দেয় বিছাইয়া, একখানি অন্ধকার
অনন্ত ভুবনে। দোঁহে মোরা রব চাহি
অপার তিমিরে। আর কোথা কিছু নাহি,
শুধু মোর করে তব করতলখানি,
শুধু অতি কাছাকাছি দুটি জনপ্রাণী

অসীম নির্জনে ; বিষণ্ণ বিচ্ছেদরাশি
চরাচরে আর সব ফেলিয়াছে গ্রাসি—
শুধু এক প্রান্তে তার প্রলয়মগন
বাকি আছে একখানি শঙ্কিত মিলন,
দুটি হাত, ত্রস্ত কপোতের মতো দুটি
বক্ষ দুরুদুরু— দুই প্রাণে আছে ফুটি
শুধু একখানি ভয়, একখানি আশা,
একখানি অশ্রুভরে নম্র ভালোবাসা ॥

আজিকে এমনি তবে কাটিবে যামিনী
আলস্যবিলাসে। অয়ি নিরভিমানিনী,
অয়ি মোর জীবনের প্রথম প্রেয়সী,
মোর ভাগ্যগগনের সৌন্দর্যের শশী,
মনে আছে কবে কোন্ ফুল্লযূথীবনে,
বহু বাল্যকালে, দেখা হত দুই জনে
আধো-চেনাশোনা ? তুমি এই পৃথিবীর
প্রতিবেশিনীর মেয়ে, ধরার অস্থির
এক বালকের সাথে কী খেলা খেলাতে,
সখী, আসিতে হাসিয়া— তরুণ প্রভাতে
নবীন বালিকামূর্তি, শুভ্রবস্ত্র পরি
উষার কিরণধারে সদ্য স্নান করি
বিকচ কুসুম-সম ফুল্লমুখখানি
নিদ্রাভঙ্গে দেখা দিতে, নিয়ে যেতে টানি
উপবনে কুড়াতে শেফালি। বারে বারে

শৈশবকর্তব্য হতে ভুলায়ে আমারে,
ফেলে দিয়ে পুঁথিপত্র, কেড়ে নিয়ে খড়ি,
দেখায়ে গোপন পথ দিতে মুক্ত করি
পাঠশালা-কারা হতে ; কোথা গৃহকোণে
নিয়ে যেতে নির্জনেতে রহস্যভবনে ;
জনশূন্য গৃহছাদে আকাশের তলে
কী করিতে খেলা ; কী বিচিত্র কথা ব'লে
ভুলাতে আমারে, স্বপ্নসম চমৎকার,
অর্থহীন, সত্য মিথ্যা তুমি জান তার।
দুটি কর্ণে দুলিত মুকুতা, দুটি করে
সোনার বলয়, দুটি কপোলের 'পরে
খেলিত অলক, দুটি স্বচ্ছ নেত্র হতে
কাঁপিত আলোক নির্মল নির্ঝরস্রোতে
চূর্ণরশ্মি-সম। দোঁহে দোঁহা ভালো ক'রে
চিনিবার আগে, নিশ্চিন্ত বিশ্বাস-ভরে
খেলাধুলা ছুটাছুটি দুজনে সতত—
কথাবার্তা, বেশবাস বিথান বিতত॥

তার পরে একদিন, কী জানি সে কবে,
জীবনের বনে যৌবনবসন্তে যবে
প্রথম মলয়বায়ু ফেলেছে নিশ্বাস,
মুকুলিয়া উঠিতেছে শত নব আশ,
সহসা চকিত হয়ে আপন সংগীতে
চমকিয়া হেরিলাম— খেলাক্ষেত্র হতে

কখন অন্তরলক্ষ্মী এসেছ অন্তরে,
আপনার অন্তঃপুরে গৌরবের ভরে
বসি আছ মহিষীর মতো। কে তোমারে
এনেছিল বরণ করিয়া! পুরদ্বারে
কে দিয়াছে হুলুধ্বনি! ভরিয়া অঞ্চল
কে করেছে বরিষন নবপুষ্পদল
তোমার আনম্র শিরে আনন্দে আদরে!
সুন্দর সাহানারাগে বংশীর সুস্বরে
কী উৎসব হয়েছিল আমার জগতে
যেদিন প্রথম তুমি পুষ্পফুল্ল পথে
লজ্জামুকুলিত মুখে রক্তিম-অম্বরে
বধূ হয়ে প্রবেশিলে চিরদিনতরে
আমার অন্তরগৃহে— যে গুপ্ত আলয়ে
অন্তর্যামী জেগে আছে সুখদুঃখ লয়ে,
যেখানে আমার যত লজ্জা আশা ভয়
সদাকম্পমান, পরশ নাহিকো সয়
এত সুকুমার! ছিলে খেলার সঙ্গিনী—
এখন হয়েছ মোর মর্মের গেহিনী,
জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কোথা সেই
অমূলক হাসি-অশ্রু, সে চাঞ্চল্য নেই,
সে বাহুল্যকথা। স্নিগ্ধ দৃষ্টি সুগম্ভীর
স্বচ্ছ নীলাম্বর-সম; হাসিখানি স্থির
অশ্রুশিশিরেতে ধৌত; পরিপূর্ণ দেহ
মঞ্জরিত বল্লরীর মতো; প্রীতিস্নেহ

গভীর সংগীততানে উঠিছে ধ্বনিয়া
স্বর্ণবীণাতন্ত্রী হতে রণিয়া রণিয়া
অনন্ত বেদনা বহি। সে অবধি প্রিয়ে,
রয়েছি বিস্মিত হয়ে— তোমারে চাহিয়ে
কোথাও না পাই অন্ত। কোন্ বিশ্বপার
আছে তব জন্মভূমি! সংগীত তোমার
কত দূরে নিয়ে যাবে, কোন্ কল্পলোকে
আমারে করিবে বন্দী গানের পুলকে
বিমুগ্ধ কুরঙ্গ-সম। এই-যে বেদনা
এর কোনো ভাষা আছে? এই-যে বাসনা
এর কোনো তৃপ্তি আছে? এই-যে উদার
সমুদ্রের মাঝখানে হয়ে কর্ণধার
ভাসায়েছ সুন্দর তরণী, দশ দিশি
অস্ফুট কল্লোলধ্বনি চিরদিবানিশি
কী কথা বলিছে কিছু নারি বুঝিবারে,
এর কোনো কূল আছে? সৌন্দর্যপাথারে
যে বেদনাবায়ু-ভরে ছুটে মনোতরী
সে বাতাসে কতবার মনে শঙ্কা করি
ছিন্ন হয়ে গেল বুঝি হৃদয়ের পাল;
অভয়-আশ্বাস-ভরা নয়ন বিশাল
হেরিয়া ভরসা পাই; বিশ্বাস বিপুল
জাগে মনে— আছে এক মহা-উপকূল
এই সৌন্দর্যের তটে, বাসনার তীরে
মোদের দোঁহার গৃহ॥

হাসিতেছ ধীরে
চাহি মোর মুখে ওগো রহস্যমধুরা।
কী বলিতে চাহ মোরে প্রণয়বিধুরা
সীমন্তিনী মোর, কী কথা বুঝাতে চাও?
কিছু ব'লে কাজ নাই— শুধু ঢেকে দাও
আমার সর্বাঙ্গ মন তোমার অঞ্চলে,
সম্পূর্ণ হরণ করি লহ গো সবলে
আমার আমারে; নগ্ন বক্ষে বক্ষ দিয়া
অন্তররহস্য তব শুনে নিই প্রিয়া।
তোমার হৃদয়কম্প অঙ্গুলির মতো
আমার হৃদয়তন্ত্রী করিবে প্রহত;
সংগীততরঙ্গধ্বনি উঠিবে গুঞ্জরি
সমস্ত জীবন ব্যাপী থরথর করি।
নাই-বা বুঝিনু কিছু, নাই-বা বলিনু,
নাই-বা গাঁথিনু গান, নাই-বা চলিনু
ছন্দোবদ্ধ পথে সলজ্জ হৃদয়খানি
টানিয়া বাহিরে! শুধু ভুলে গিয়ে বাণী
কাঁপিব সংগীতভরে, নক্ষত্রের প্রায়
শিহরি জ্বলিব শুধু কম্পিত শিখায়,
শুধু তরঙ্গের মতো ভাঙিয়া পড়িব
তোমার তরঙ্গ-পানে, বাঁচিব মরিব
শুধু, আর কিছু করিব না। দাও সেই
প্রকাণ্ড প্রবাহ যাহে এক মুহূর্তেই
জীবন করিয়া পূর্ণ, কথা না বলিয়া

উন্মত্ত হইয়া যাই উদ্দাম চলিয়া॥

মানসীরূপিণী ওগো বাসনাবাসিনী,
আলোকবসনা ওগো নীরবভাষিণী,
পরজন্মে তুমি কি গো মূর্তিমতী হয়ে
জন্মিবে মানবগৃহে নারীরূপ লয়ে
অনিন্দ্যসুন্দরী? এখন ভাসিছ তুমি
অনন্তের মাঝে; স্বর্গ হতে মর্তভূমি
করিছ বিহার; সন্ধ্যার কনকবর্ণে
রাঙিছ অঞ্চল; উষার গলিত স্বর্ণে
গড়িছ মেখলা; পূর্ণ তটিনীর জলে
করিছ বিস্তার তলতল-ছলছলে
ললিত যৌবনখানি; বসন্তবাতাসে
চঞ্চল বাসনাব্যথা সুগন্ধ নিশ্বাসে
করিছ প্রকাশ; নিষুপ্ত পূর্ণিমারাতে
নির্জন গগনে একাকিনী ক্লান্ত হাতে
বিছাইছ দুগ্ধশুভ্র বিরহশয়ন;
শরৎপ্রত্যুষে উঠি করিছ চয়ন
শেফালি, গাঁথিতে মালা ভুলে গিয়ে শেষে
তরুতলে ফেলে দিয়ে আলুলিত কেশে
গভীর অরণ্যছায়ে উদাসিনী হয়ে
বসে থাক; ঝিকিমিকি আলোছায়া লয়ে
কম্পিত অঙ্গুলি দিয়ে বিকালবেলায়
বসন বয়ন কর বকুলতলায়;

অবসন্ন দিবালোকে কোথা হতে ধীরে
ঘনপল্লবিত কুঞ্জে সরোবরতীরে
করুণ কপোতকণ্ঠে গাও মুলতান ;
কখন অজ্ঞাতে আসি ছুঁয়ে যাও প্রাণ
সকৌতুকে ; করি দাও হৃদয় বিকল ;
অঞ্চল ধরিতে গেলে পালাও চঞ্চল
কলকণ্ঠে হাসি ; অসীম আকাজ্ক্ষারাশি
জাগাইয়া প্রাণে, দ্রুতপদে উপহাসি
মিলাইয়া যাও নভোনীলিমার মাঝে।
কখনো মগন হয়ে আছি যবে কাজে
স্খলিতবসন তব শুভ্র রূপখানি
নগ্ন বিদ্যুতের আলো নয়নেতে হানি
চকিতে চমকি চলি যায়। জানালায়
একেলা বসিয়া যবে আঁধার সন্ধ্যায়,
মুখে হাত দিয়ে, মাতৃহীন বালকের
মতো বহুক্ষণ কাঁদি স্নেহ-আলোকের
তরে— ইচ্ছা করি, নিশার আঁধারস্রোতে
মুছে ফেলে দিয়ে যায় সৃষ্টিপট হতে
এই ক্ষীণ অর্থহীন অস্তিত্বের রেখা—
তখন করুণাময়ী দাও তুমি দেখা
তারকা-আলোক-জ্বালা স্তব্ধ রজনীর
প্রান্ত হতে নিঃশব্দে আসিয়া ; অশ্রুনীর
অঞ্চলে মুছায়ে দাও ; চাও মুখপানে
স্নেহময় প্রশ্নভরা করুণ নয়ানে ;

নয়ন চুম্বন কর ; স্নিগ্ধ হস্তখানি
ললাটে বুলায়ে দাও ; না কহিয়া বাণী,
সান্ত্বনা ভরিয়া প্রাণে, কবিরে তোমার
ঘুম পাড়াইয়া দিয়া কখন আবার
চলে যাও নিঃশব্দচরণে ॥

সেই তুমি
মূর্তিতে দিবে কি ধরা ? এই মর্তভূমি
পরশ করিবে রাঙা চরণের তলে ?
অন্তরে বাহিরে বিশ্বে শূন্যে জলে স্থলে
সর্ব ঠাঁই হতে সর্বময়ী আপনারে
করিয়া হরণ, ধরণীর এক ধারে
ধরিবে কি একখানি মধুর মুরতি ?
নদী হতে লতা হতে আনি তব গতি
অঙ্গে অঙ্গে নানা ভঙ্গে দিবে হিল্লোলিয়া—
বাহুতে বাঁকিয়া পড়ি, গ্রীবায় হেলিয়া
ভাবের বিকাশভরে ? কী নীল বসন
পরিবে সুন্দরী তুমি ? কেমন কঙ্কণ
ধরিবে দুখানি হাতে ? কবরী কেমনে
বাঁধিবে, নিপুণ বেণী বিনায়ে যতনে ?
কচি কেশগুলি পড়ি শুভ্র গ্রীবা-'পরে
শিরীষকুসুমসম[১] সমীরণভরে
কাঁপিবে কেমন ? শ্রাবণে দিগন্তপারে
যে গভীর স্নিগ্ধ দৃষ্টি ঘন মেঘভারে

দেখা দেয়, নবনীল, অতি সুকুমার,
সে দৃষ্টি না জানি ধরে কেমন আকার
নারীচক্ষে! কী সঘন পল্লবের ছায়,
কী সুদীর্ঘ কী নিবিড় তিমির-আভায়
মুগ্ধ অন্তরের মাঝে ঘনাইয়া আনে
সুখবিভাবরী! অধর কী সুধাদানে
রহিবে উন্মুখ, পরিপূর্ণ বাণীভরে
নিশ্চল নীরব! লাবণ্যের থরে থরে
অঙ্গখানি কী করিয়া মুকুলি বিকশি
অনিবার সৌন্দর্যেতে উঠিবে উচ্ছ্বসি
নিঃসহ যৌবনে?।

জানি, আমি জানি সখী,
যদি আমাদের দোঁহে হয় চোখোচোখি
সেই পরজন্মপথে, দাঁড়াব থমকি;
নিদ্রিত অতীত কাঁপি উঠিবে চমকি
লভিয়া চেতনা। জানি, মনে হবে মম,
চিরজীবনের মোর ধ্রুবতারা-সম
চিরপরিচয়-ভরা ওই কালো চোখ।
আমার নয়ন হতে লইয়া আলোক,
আমার অন্তর হতে লইয়া বাসনা,
আমার গোপন প্রেম করেছে রচনা
এই মুখখানি। তুমিও কি মনে মনে
চিনিবে আমারে? আমাদের দুই জনে

হবে কি মিলন ? দুটি বাহু দিয়ে, বালা,
কখনো কি এই কণ্ঠে পরাইবে মালা
বসন্তের ফুলে ? কখনো কি বক্ষ ভরি
নিবিড় বন্ধনে তোমারে, হৃদয়েশ্বরী,
পারিব বাঁধিতে ? পরশে পরশে দোঁহে
করি বিনিময় মরিব মধুর মোহে
দেহের দুয়ারে ? জীবনের প্রতি দিন
তোমার আলোক পাবে বিচ্ছেদবিহীন,
জীবনের প্রতি রাত্রি হবে সুমধুর
মাধুর্যে তোমার, বাজিবে তোমার সুর
সর্ব দেহে মনে ? জীবনের প্রতি সুখে
পড়িবে তোমার শুভ্র হাসি, প্রতি দুখে
পড়িবে তোমার অশ্রুজল। প্রতি কাজে
রবে তব শুভহস্ত দুটি। গৃহমাঝে
জাগায়ে রাখিবে সদা সুমঙ্গল জ্যোতি।
এ কি শুধু বাসনার বিফল মিনতি,
কল্পনার ছল ? কার এত দিব্যজ্ঞান,
কে বলিতে পারে মোরে নিশ্চয় প্রমাণ—
পূর্বজন্মে নারীরূপে ছিলে কি না তুমি
আমারি জীবনবনে সৌন্দর্যে কুসুমি,
প্রণয়ে বিকশি ? মিলনে আছিলে বাঁধা
শুধু এক ঠাঁই, বিরহে টুটিয়া বাধা
আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ প্রিয়ে—
তোমারে দেখিতে পাই সর্বত্র চাহিয়ে।

ধূপ দগ্ধ হয়ে গেছে, গন্ধবাষ্প তার
পূর্ণ করি ফেলিয়াছে আজি চারি ধার।
গৃহের বনিতা ছিলে, টুটিয়া আলয়
বিশ্বের কবিতারূপে হয়েছ উদয়—
তবু কোন্ মায়াডোরে চিরসোহাগিনী,
হৃদয়ে দিয়েছ ধরা, বিচিত্র রাগিণী
জাগায়ে তুলিছ প্রাণে চিরস্মৃতিময়।
তাই তো এখনো মনে আশা জেগে রয়
আবার তোমারে পাব পরশবন্ধনে।
এমনি সমস্ত বিশ্ব প্রলয়ে সৃজনে
জ্বলিছে নিবিছে, যেন খদ্যোতের জ্যোতি,
কখনো-বা ভাবময়, কখনো মূরতি ॥

রজনী গভীর হল, দীপ নিবে আসে;
পদ্মার সুদূর পারে পশ্চিম-আকাশে
কখন যে সায়াহ্নের শেষ স্বর্ণরেখা
মিলাইয়া গেছে; সপ্তর্ষি দিয়েছে দেখা
তিমিরগগনে; শেষ ঘট পূর্ণ ক'রে
কখন বালিকাবধূ চলে গেছে ঘরে;
হেরি কৃষ্ণপক্ষ রাত্রি, একাদশী তিথি,
দীর্ঘ পথ, শূন্য ক্ষেত্র, হয়েছে অতিথি
গ্রামে গৃহস্থের ঘরে পান্থ পরবাসী;
কখন গিয়েছে থেমে কলরবরাশি

মাঠ-পারে কৃষিপল্লী হতে ; নদীতীরে
বৃদ্ধ কৃষাণের জীর্ণ নিভৃত কুটিরে
কখন জ্বলিয়াছিল সন্ধ্যাদীপখানি,
কখন নিবিয়া গেছে— কিছুই না জানি ॥

কী কথা বলিতেছিনু কী জানি, প্রেয়সী,
অর্ধ-অচেতন-ভাবে মনোমাঝে পশি
স্বপ্নমুগ্ধমত। কেহ শুনেছিলে সে কি,
কিছু বুঝেছিলে প্রিয়ে, কোথাও আছে কি
কোনো অর্থ তার ? সব কথা গেছি ভুলে,
শুধু এই নিদ্রাপূর্ণ নিশীথের কূলে
অন্তরের অন্তহীন অশ্রুপারাবার
উদ্‌বেলিয়া উঠিয়াছে হৃদয়ে আমার
গম্ভীর নিস্বনে ॥

এসো সুপ্তি, এসো শান্তি,
এসো, প্রিয়ে, মুগ্ধ মৌন সকরুণকান্তি,
বক্ষে মোরে লহো টানি— শোয়াও যতনে
মরণসুস্নিগ্ধ শুভ্র বিস্মৃতিশয়নে ॥

শিলাইদহ। বোট
৪ পৌষ ১২৯৯

১ পাণ্ডুলিপি-ধৃত পাঠান্তর : শিরীষকেশরসম

অনাদৃত

তখন তরুণ রবি প্রভাতকালে
আনিছে উষার পূজা সোনার থালে।
সীমাহীন নীল জল
করিতেছে থলথল্,
রাঙা রেখা জ্বলজ্বল্
কিরণমালে।
তখন উঠিছে রবি গগনভালে॥

গাঁথিতেছিলাম জাল বসিয়া তীরে।
বারেক অতল-পানে চাহিনু ধীরে—
শুনিনু কাহার বাণী
পরান লইল টানি,
যতনে সে জালখানি
তুলিয়া শিরে
ঘুরায়ে ফেলিয়া দিনু সুদূর নীরে॥

নাহি জানি কত কী যে উঠিল জালে।
কোনোটা হাসির মতো কিরণ ঢালে,
কোনোটা-বা টলটল্
কঠিন নয়নজল,
কোনোটা শরমছল
বধূর গালে—
সেদিন সাগরতীরে প্রভাতকালে ॥

বেলা বেড়ে ওঠে, রবি ছাড়ি পুরবে
গগনের মাঝখানে ওঠে গরবে।
ক্ষুধাতৃষ্ণা সব ভুলি
জাল ফেলে টেনে তুলি—
উঠিল গোধূলিধূলি
ধূসর নভে,
গাভীগণ গৃহে ধায় হরষরবে ॥

লয়ে দিবসের ভার ফিরিনু ঘরে
তখন উঠিছে চাঁদ আকাশ-'পরে
গ্রামপথে নাহি লোক,
পড়ে আছে ছায়ালোক,
মুদে আসে দুটি চোখ
স্বপনভরে—
ডাকিছে বিরহী পাখি কাতর স্বরে

সে তখন গৃহকাজ সমাধা করি
কাননে বসিয়া ছিল মালাটি পরি।
কুসুম একটি দুটি
তরু হতে পড়ে টুটি,
সে করিছে কুটিকুটি
নখেতে ধরি—
আলসে আপন-মনে সময় হরি॥

বারেক আগিয়ে যাই, বারেক পিছু।
কাছে গিয়ে দাঁড়ালেম নয়ন নিচু।
যা ছিল চরণে রেখে
ভূমিতল দিনু ঢেকে,
সে কহিল দেখে দেখে
'চিনি নে কিছু'—
শুনি রহিলাম শির করিয়া নিচু॥

ভাবিলাম সারা দিন সারাটি বেলা
বসে বসে করিয়াছি কী ছেলেখেলা!
না জানি কী মোহে ভুলে
গেনু অকূলের কূলে,
ঝাঁপ দিনু কুতূহলে—
আনিনু মেলা
অজানা সাগর হতে অজানা ঢেলা॥

বুঝি নাই, খুঁজি নাই হাটের মাঝে—
এমন হেলার ধন দেওয়া কি সাজে!
কোনো দুখ নাহি যার,
কোনো তৃষা বাসনার,
এ-সব লাগিবে তার
কিসের কাজে!
কুড়ায়ে লইনু পুন মনের লাজে ॥

সারাটি রজনী বসি দুয়ারদেশে
একে একে ফেলে দিনু পথের শেষে
সুখহীন ধনহীন
চলে গেনু উদাসীন—
প্রভাতে পরের দিন
পথিকে এসে
সব তুলে নিয়ে গেল আপন দেশে ॥

তালদণ্ডা খাল
পাণ্ডুয়া হইতে কটকের পথে
২২ ফাল্গুন ১২৯৯

নদীপথে

গগন ঢাকা ঘন মেঘে,
পবন বহে খর বেগে।
অশনি ঝন ঝন
ধ্বনিছে ঘন ঘন,
নদীতে ঢেউ উঠে জেগে।
পবন বহে খর বেগে॥

তীরেতে তরুরাজি দোলে
আকুল মর্ম্মররোলে।
চিকুর চিকিমিকে
চকিয়া দিকে দিকে
তিমির চিরি যায় চলে।
তীরেতে তরুরাজি দোলে॥

ঝরিছে বাদলের ধারা
বিরামবিশ্রামহারা।
বারেক থেমে আসে,
দ্বিগুণ উচ্ছ্বাসে

আবার পাগলের পারা
ঝরিছে বাদলের ধারা ॥

মেঘেতে পথরেখা লীন,
প্রহর তাই গতিহীন।
গগনপানে চাই,
জানিতে নাহি পাই
গেছে কি নাহি গেছে দিন।
প্রহর তাই গতিহীন ॥

তীরেতে বাঁধিয়াছি তরী,
রয়েছি সারা দিন ধরি।
এখনো পথ নাকি
অনেক আছে বাকি,
আসিছে ঘোর বিভাবরী।
তীরেতে বাঁধিয়াছি তরী ॥

বসিয়া তরণীর কোণে
একেলা ভাবি মনে মনে—
মেঝেতে শেজ পাতি
সে আজি জাগে রাতি,
নিদ্রা নাহি দু নয়নে।
বসিয়া ভাবি মনে মনে ॥

মেঘের ডাক শুনে কাঁপে,
হৃদয় দুই হাতে চাপে।
আকাশপানে চায়,
ভরসা নাহি পায়,
তরাসে সারা নিশি যাপে।
মেঘের ডাক শুনে কাঁপে॥

কভু-বা বায়ুবেগভরে
দুয়ার ঝন্‌ঝনি পড়ে।
প্রদীপ নিবে আসে,
ছায়াটি কাঁপে ত্রাসে,
নয়নে আঁখিজল ঝরে,
বক্ষ কাঁপে থরথরে॥

চকিত আঁখি দুটি তার
মনে আসিছে বার বার।
বাহিরে মহা ঝড়,
বজ্র কড়মড়,
আকাশ করে হাহাকার।
মনে পড়িছে আঁখি তার॥

গগন ঢাকা ঘন মেঘে,
পবন বহে খর বেগে।

অশনি ঝন ঝন
ধ্বনিছে ঘন ঘন,
নদীতে ঢেউ উঠে জেগে।
পবন বহে আজি বেগে॥

খাল-পথে। ঝড়বৃষ্টি। অপরাহ্ণ
২৬ ফাল্গুন ১২৯৯

দেউল

রচিয়াছিনু দেউল একখানি
অনেক দিনে অনেক দুখ মানি।
রাখি নি তার জানালা দ্বার,
সকল দিক অন্ধকার—
ভূধর হতে পাষাণভার
যতনে বহি আনি
রচিয়াছিনু দেউল একখানি॥

দেবতাটিরে বসায়ে মাঝখানে
ছিলাম চেয়ে তাহারি মুখপানে।
বাহিরে ফেলি এ ত্রিভুবন
ভুলিয়া গিয়া বিশ্বজন
ধেয়ান তারি অনুক্ষণ
করেছি একপ্রাণে,
দেবতাটিরে বসায়ে মাঝখানে॥

যাপন করি অন্তহীন রাতি
জ্বালায়ে শত গন্ধময় বাতি।
কনকমনি-পাত্রপুটে
সুরভি ধূপধূম্র উঠে,
গুরু অগুরু-গন্ধ ছুটে,
পরান উঠে মাতি।
যাপন করি অন্তহীন রাতি॥

নিদ্রাহীন বসিয়া এক-চিতে
চিত্র কত এঁকেছি চারি ভিতে।
   স্বপ্নসম চমৎকার,
   কোথাও নাহি উপমা তার—
   কত বরন, কত আকার
      কে পারে বরনিতে
চিত্র যত এঁকেছি চারি ভিতে॥

স্তম্ভগুলি জড়ায়ে শত পাকে
নাগবালিকা ফণা তুলিয়া থাকে।
   উপরে ঘিরি চারিটি ধার
   দৈত্যগুলি বিকটাকার,
   পাষাণময় ছাদের ভার
      মাথায় ধরি রাখে।
নাগবালিকা ফণা তুলিয়া থাকে॥

সৃষ্টিছাড়া সৃজন কত-মতো।
পক্ষীরাজ উড়িছে শত শত।
   ফুলের মতো লতার মাঝে
   নারীর মুখ বিকশি রাজে
   প্রণয়-ভরা বিনয়ে লাজে
      নয়ন করি নত।
সৃষ্টিছাড়া সৃজন কত-মতো॥

ধ্বনিত এই ধরার মাঝখানে
শুধু এ গৃহ শব্দ নাহি জানে।
ব্যাঘ্রাজিন-আসন পাতি
বিবিধরূপ ছন্দ গাঁথি
মন্ত্র পড়ি দিবস রাতি
গুঞ্জরিত তানে,
শব্দহীন গৃহের মাঝখানে॥

এমন করে গিয়েছে কত দিন
জানি নে কিছু, আছি আপন-লীন।
চিত্ত মোর নিমেষহত
ঊর্ধ্বমুখী শিখার মতো,
শরীরখানি মূর্ছাহত
ভাবের তাপে ক্ষীণ।
এমন করে গিয়েছে কত দিন॥

একদা এক বিষম ঘোর স্বরে
বজ্র আসি পড়িল মোর ঘরে।
বেদনা এক তীক্ষ্ণতম
পশিল গিয়ে হৃদয়ে মম,
অগ্নিময় সর্পসম
কাটিল অন্তরে।
বজ্র আসি পড়িল মোর ঘরে॥

পাষাণরাশি সহসা গেল টুটি,
গৃহের মাঝে দিবস উঠে ফুটি।
নীরব ধ্যান করিয়া চূর
কঠিন বাঁধ করিয়া দূর
সংসারের অশেষ সুর
ভিতরে এল ছুটি।
পাষাণরাশি সহসা গেল টুটি॥

দেবতাপানে চাহিনু একবার,
আলোক আসি পড়েছে মুখে তাঁর
নূতন এক মহিমারাশি
ললাটে তাঁর উঠেছে ভাসি,
জাগিছে এক প্রসাদহাসি
অধর-চারিধার।
দেবতাপানে চাহিনু একবার॥

শরমে দীপ মলিন একেবারে
লুকাতে চাহে চির-অন্ধকারে।
শিকলে বাঁধা স্বপ্নমত
ভিত্তি-আঁকা চিত্র যত
আলোক দেখি লজ্জাহত
পালাতে নাহি পারে।
শরমে দীপ মলিন একেবারে॥

যে গান আমি নারিনু রচিবারে
সে গান আজি উঠিল চারি ধারে।
আমার দীপ জ্বালিল রবি,
প্রকৃতি আসি আঁকিল ছবি,
গাঁথিল গান শতেক কবি
কতই ছন্দোহারে।
কী গান আজি উঠিল চারি ধারে॥

দেউলে মোর দুয়ার গেল খুলি—
ভিতরে আর বাহিরে কোলাকুলি।
দেবের করপরশ লাগি
দেবতা মোর উঠিল জাগি,
বন্দী নিশি গেল সে ভাগি
আঁধার পাখা তুলি।
দেউলে মোর দুয়ার গেল খুলি॥

তালদণ্ডা খাল
বালিয়া হইতে কটক-পথে
২৩ ফাল্গুন ১২৯৯

বিশ্বনৃত্য

বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে
কে বাজাবে সেই বাজনা !
উঠিবে চিত্ত করিয়া নৃত্য,
বিস্মৃত হবে আপনা।
টুটিবে বন্ধ, মহা আনন্দ,
নব সংগীতে নূতন ছন্দ,
হৃদয়সাগরে পূর্ণচন্দ্র
জাগাবে নবীন বাসনা ॥

সঘন অশ্রুমগন হাস্য
জাগিবে তাহার বদনে
প্রভাত-অরুণ-কিরণ-রশ্মি
ফুটিবে তাহার নয়নে।
দক্ষিণ করে ধরিয়া যন্ত্র
ঝনন-রণন স্বর্ণতন্ত্র,
কাঁপিয়া উঠিবে মোহনমন্ত্র
নির্মল নীল গগনে ॥

হাহা করি সবে উচ্ছল রবে
চঞ্চল কলকলিয়া

চৌদিক হতে উন্মাদ স্রোতে
আসিবে তূর্ণ চলিয়া।
ছুটিবে সঙ্গে মহাতরঙ্গে
ঘিরিয়া তাঁহারে হরষরঙ্গে
বিঘ্নতরণ চরণভঙ্গে
পথকণ্টক দলিয়া॥

দ্যুলোক চাহিয়া সে লোকসিন্ধু
বন্ধনপাশ নাশিবে,
অসীম পুলকে বিশ্বভূলোকে
অঙ্কে তুলিয়া হাসিবে।
ঊর্মিলীলায় সূর্যকিরণ
ঠিকরি উঠিবে হিরণবরন,
বিঘ্নবিপদ দুঃখমরণ
ফেনের মতন ভাসিবে॥

ওগো, কে বাজায়, বুঝি শুনা যায়,
মহা রহস্যে রসিয়া
চিরকাল ধরে গম্ভীর স্বরে
অম্বর'পরে বসিয়া।
গ্রহমণ্ডল হয়েছে পাগল,
ফিরিছে নাচিয়া চিরচঞ্চল—
গগনে গগনে জ্যোতি-অঞ্চল
পড়িছে খসিয়া খসিয়া॥

ওগো, কে বাজায়, কে শুনিতে পায়,
না জানি কী মহা রাগিণী !
দুলিয়া ফুলিয়া নাচিছে সিন্ধু
সহস্রশির নাগিনী।
ঘন অরণ্য আনন্দে দুলে—
অনন্ত নভে শত বাহু তুলে,
কী গাহিতে গিয়ে কথা যায় ভুলে,
মর্মরে দিনযামিনী ॥

নির্ঝর ঝরে উচ্ছ্বাসভরে
বন্ধুর শিলাসরণে
ছন্দে ছন্দে সুন্দরগতি
পাষাণহৃদয়হরণে !
কোমল কণ্ঠে কুলুকুলু স্বর
ফুটে অবিরল তরল মধুর,
সদাশিঞ্জিত মানিকনূপুর
বাঁধা চঞ্চল চরণে ॥

নাচে ছয় ঋতু, না মানে বিরাম,
বাহুতে বাহুতে ধরিয়া,
শ্যামল স্বর্ণ বিবিধবর্ণ
নব নব বাস পরিয়া।
চরণ ফেলিতে কত বনফুল
ফুটে ফুটে টুটে হইয়া আকুল,

উঠে ধরণীর হৃদয় বিপুল
হাসিক্রন্দনে ভরিয়া ॥

পশুবিহঙ্গ কীটপতঙ্গ
জীবনের ধারা ছুটিছে।
কী মহাখেলায় মরণবেলায়
তরঙ্গ তার টুটিছে।
কোনোখানে আলো কোনোখানে ছায়া,
জেগে জেগে ওঠে নব নব কায়া,
চেতনাপূর্ণ অদ্ভুত মায়া
বুদ্‌বুদসম ফুটিছে ॥

ওই কে বাজায় দিবসনিশায়
বসি অন্তর-আসনে
কালের যন্ত্রে বিচিত্র সুর—
কেহ শোনে কেহ না শোনে।
অর্থ কী তার ভাবিয়া না পাই,
কত গুণী জ্ঞানী চিন্তিছে তাই,
মহান্ মানব-মানস সদাই
উঠে পড়ে তারি শাসনে ॥

শুধু হেথা কেন আনন্দ নাই,
কেন আছে সবে নীরবে ?

তারকা না দেখি পশ্চিমাকাশে,
প্রভাত না দেখি পুরবে।
শুধু চারি দিকে প্রাচীন পাষাণ
জগৎব্যাপ্ত সমাধি-সমান
গ্রাসিয়া রেখেছে অযুত পরান,
রয়েছে অটল গরবে॥

সংসারস্রোত জাহ্নবীসম
বহু দূরে গেছে সরিয়া।
এ শুধু ঊষর বালুকাধূসর
মরুরূপে আছে মরিয়া।
নাহি কোনো গতি, নাহি কোনো গান,
নাহি কোনো কাজ, নাহি কোনো প্রাণ,
বসে আছে এক মহানির্বাণ
আঁধার-মুকুট পরিয়া॥

হৃদয় আমার ক্রন্দন করে
মানবহৃদয়ে মিশিতে—
নিখিলের সাথে মহা রাজপথে
চলিতে দিবসনিশীথে।
আজন্মকাল পড়ে আছি মৃত
জড়তার মাঝে হয়ে পরাজিত,
একটি বিন্দু জীবন-অমৃত
কে গো দিবে এই তৃষিতে?॥

জগৎ-মাতানো সংগীততানে
কে দিবে এদের নাচায়ে!
জগতের প্রাণ করাইয়া পান
কে দিবে এদের বাঁচায়ে!
ছিঁড়িয়া ফেলিবে জাতিজালপাশ,
মুক্ত হৃদয়ে লাগিবে বাতাস,
ঘুচায়ে ফেলিয়া মিথ্যা তরাস
ভাঙিবে জীর্ণ খাঁচা এ॥

বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে
বাজুক বিশ্ববাজনা!
উঠুক চিত্ত করিয়া নৃত্য
বিস্মৃত হয়ে আপনা।
টুটুক বন্ধ, মহা আনন্দ,
নব সংগীতে নূতন ছন্দ—
হৃদয়সাগরে পূর্ণচন্দ্র
জাগাক নবীন বাসনা॥

বৈতরণী। জাহাজ 'উড়িয়া'
কটক হইতে কলিকাতা-পথে
শুক্রবার? ২৮ ফাল্গুন ১২৯৯

দুর্বোধ

তুমি মোরে পার না বুঝিতে ?
প্রশান্ত বিষাদভরে
দুটি আঁখি প্রশ্ন ক'রে
অর্থ মোর চাহিছে খুঁজিতে,
চন্দ্রমা যেমন-ভাবে স্থিরনতমুখে
চেয়ে দেখে সমুদ্রের বুকে ॥

কিছু আমি করি নি গোপন।
যাহা আছে সব আছে
তোমার আঁখির কাছে
প্রসারিত অবারিত মন।
দিয়েছি সমস্ত মোর করিতে ধারণা,
তাই মোরে বুঝিতে পার না ?।

এ যদি হইত শুধু মণি,
শত খণ্ড করি তারে
সযত্নে বিবিধাকারে
একটি একটি করি গণি
একখানি সূত্রে গাঁথি একখানি হার
পরাতেম গলায় তোমার ॥

এ যদি হইত শুধু ফুল,
সুগোল সুন্দর ছোটো,
উষালোকে ফোটো-ফোটো,
বসন্তের পবনে দোদুল,
বৃন্ত হতে সযতনে আনিতাম তুলে—
পরায়ে দিতেম কালো চুলে ॥

এ যে, সখী, সমস্ত হৃদয়।
কোথা জল, কোথা কূল,
দিক্ হয়ে যায় ভুল,
অন্তহীন রহস্যনিলয়।
এ রাজ্যের আদি অন্ত নাহি জান' রানী—
এ তবু তোমার রাজধানী ॥

কী তোমারে চাহি বুঝাইতে?
গভীর হৃদয়মাঝে
নাহি জানি কী যে বাজে

নিশিদিন নীরব সংগীতে—
শব্দহীন স্তব্ধতায় ব্যাপিয়া গগন
রজনীর ধ্বনির মতন ॥

এ যদি হইত শুধু সুখ,
কেবল একটি হাসি
অধরের প্রান্তে আসি
আনন্দ করিত জাগরূক।
মুহূর্তে বুঝিয়া নিতে হৃদয়বারতা,
বলিতে হ'ত না কোনো কথা ॥

এ যদি হইত শুধু দুখ,
দুটি বিন্দু অশ্রুজল
দুই চক্ষে ছলছল,
বিষণ্ণ অধর, ম্লান মুখ—
প্রত্যক্ষ দেখিতে পেতে অন্তরের ব্যথা,
নীরবে প্রকাশ হ'ত কথা ॥

এ যে, সখী, হৃদয়ের প্রেম—
সুখদুঃখবেদনার
আদি অন্ত নাহি যার—
চিরদৈন্য, চিরপূর্ণ হেম।
নব নব ব্যাকুলতা জাগে দিবারাতে,
তাই আমি না পারি বুঝাতে

নাই-বা বুঝিলে তুমি মোরে !
চিরকাল চোখে চোখে
নূতন-নূতনালোকে
পাঠ করো রাত্রিদিন ধ'রে ।
বুঝা যায় আধো প্রেম, আধখানা মন—
সমস্ত কে বুঝেছে কখন ?।

পদ্মায়। 'মিনো' জাহাজ
রাজশাহী যাইবার পথে
১১ চৈত্র ১২৯৯

ঝুলন

আমি   পরানের সাথে খেলিব আজিকে
মরণখেলা
নিশীথবেলা।
সঘন বরষা, গগন আঁধার,
হেরো বারিধারে কাঁদে চারি ধার,
ভীষণ রঙ্গে ভবতরঙ্গে
ভাসাই ভেলা;
বাহির হয়েছি স্বপ্নশয়ন
করিয়া হেলা
রাত্রিবেলা॥

ওগো,   পবনে গগনে সাগরে আজিকে
কী কল্লোল,
দে দোল দোল।
পশ্চাৎ হতে হাহা ক'রে হাসি
মত্ত ঝটিকা ঠেলা দেয় আসি,
যেন এ লক্ষ যক্ষশিশুর
অট্টরোল।
আকাশে পাতালে পাগলে মাতালে
হট্টগোল।
দে দোল দোল॥

আজি জাগিয়া উঠিয়া পরান আমার
বসিয়া আছে
বুকের কাছে।
থাকিয়া থাকিয়া উঠিছে কাঁপিয়া
ধরিছে আমার বক্ষ চাপিয়া,
নিঠুর নিবিড় বন্ধনসুখে
হৃদয় নাচে ;
ত্রাসে উল্লাসে পরান আমার
ব্যাকুলিয়াছে
বুকের কাছে ॥

হায়, এত কাল আমি রেখেছিনু তারে
যতনভরে
শয়ন'পরে।
ব্যথা পাছে লাগে, দুখ পাছে জাগে,
নিশিদিন তাই বহু অনুরাগে
বাসরশয়ন করেছি রচন
কুসুমথরে ;
দুয়ার রুধিয়া রেখেছিনু তারে
গোপন ঘরে
যতনভরে ॥

কত সোহাগ করেছি চুম্বন করি
নয়নপাতে

স্নেহের সাথে।
শুনায়েছি তারে মাথা রাখি পাশে
কত প্রিয় নাম মৃদুমধু ভাষে,
গুঞ্জরতান করিয়াছি গান
জ্যোৎস্নারাতে;
যা-কিছু মধুর দিয়েছিনু তার
দুখানি হাতে
স্নেহের সাথে॥

শেষে সুখের শয়নে শ্রান্ত পরান
আলসরসে
আবেশবশে।
পরশ করিলে জাগে না সে আর,
কুসুমের হার লাগে গুরুভার,
ঘুমে জাগরণে মিশি একাকার
নিশিদিবসে;
বেদনাবিহীন অসাড় বিরাগ
মরমে পশে
আবেশবশে॥

ঢালি মধুরে মধুর বধূরে আমার
হারাই বুঝি,
পাই নে খুঁজি।
বাসরের দীপ নিবে নিবে আসে—

ব্যাকুল নয়নে হেরি চারি পাশে
শুধু রাশি রাশি শুষ্ক কুসুম
হয়েছে পুঁজি।
অতলস্বপ্নসাগরে ডুবিয়া
মরি যে যুঝি
কাহারে খুঁজি॥

তাই ভেবেছি আজিকে খেলিতে হইবে
নূতন খেলা
রাত্রিবেলা।
মরণদোলায় ধরি রশিগাছি
বসিব দুজনে বড়ো কাছাকাছি,
ঝঞ্ঝা আসিয়া অট্ট হাসিয়া
মারিবে ঠেলা—
আমাতে প্রাণেতে খেলিব দুজনে
ঝুলনখেলা
নিশীথবেলা॥

দে দোল দোল।
দে দোল দোল।
এ মহাসাগরে তুফান তোল্।
বধূরে আমার পেয়েছি আবার—

ভরেছে কোল।
প্রিয়ারে আমার তুলেছে জাগায়ে
প্রলয়রোল।
বক্ষশোণিতে উঠেছে আবার
কী হিল্লোল!
ভিতরে বাহিরে জেগেছে আমার
কী কল্লোল!
উড়ে কুন্তল, উড়ে অঞ্চল,
উড়ে বনমালা বায়ুচঞ্চল,
বাজে কঙ্কণ বাজে কিঙ্কিণী
মত্তবোল।
দে দোল দোল॥

আয় রে ঝঞ্ঝা, পরানবধূর
আবরণরাশি করিয়া দে দূর,
করি লুণ্ঠন অবগুণ্ঠন-
বসন খোল্।
দে দোল দোল।
প্রাণেতে আমাতে মুখোমুখি আজ
চিনি লব দোঁহে ছাড়ি ভয় লাজ,
বক্ষে বক্ষে পরশিব দোঁহে
ভাবে বিভোল।
দে দোল দোল।

স্বপ্ন টুটিয়া বাহিরেছে আজ
দুটো পাগল।
দে দোল দোল॥

রামপুর বোয়ালিয়া
১৫ চৈত্র ১২৮৯

হৃদয়যমুনা

যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ এসো ওগো, এসো মোর
হৃদয়নীরে।
তলতল ছলছল কাঁদিবে গভীর জল
ওই দুটি সুকোমল চরণ ঘিরে।
আজি বর্ষা গাঢ়তম, নিবিড়কুন্তলসম
মেঘ নামিয়াছে মম দুইটি তীরে।
ওই-যে শবদ চিনি, নূপুর রিনিকিঝিনি,
কে গো তুমি একাকিনী আসিছ ধীরে?
যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ এসো ওগো, এসো মোর
হৃদয়নীরে॥

যদি কলস ভাসায়ে জলে বসিয়া থাকিতে চাও
আপনা ভুলে—
হেথা শ্যাম দূর্বাদল, নবনীল নভস্তল,
বিকশিত বনস্থল বিকচ ফুলে।
দুটি কালো আঁখি দিয়া মন যাবে বাহিরিয়া,
অঞ্চল খসিয়া গিয়া পড়িবে খুলে।
চাহিয়া বঞ্জুলবনে কী জানি পড়িবে মনে
বসি কুঞ্জে তৃণাসনে শ্যামল কূলে!
যদি কলস ভাসায়ে জলে বসিয়া থাকিতে চাও,
আপনা ভুলে॥

যদি গাহন করিতে চাহ এসো নেমে এসো হেথা
গহনতলে।
নীলাম্বরে কিবা কাজ, তীরে ফেলে এসো আজ,
ঢেকে দিবে সব লাজ সুনীল জলে
সোহাগ-তরঙ্গরাশি অঙ্গখানি দিবে গ্রাসি,
উচ্ছ্বসি পড়িবে আসি উরসে গলে—
ঘুরে ফিরে চারি পাশে কভু কাঁদে কভু হাসে,
কুলুকুলু কলভাষে কত কী ছলে!
যদি গাহন করিতে চাহ এসো নেমে এসো হেথা
গহনতলে॥

যদি মরণ লভিতে চাও এসো তবে ঝাঁপ দাও
সলিলমাঝে।
স্নিগ্ধ শান্ত সুগভীর, নাহি তল, নাহি তীর,
মৃত্যুসম নীল নীর স্থির বিরাজে।
নাহি রাত্রি দিনমান— আদি অন্ত পরিমাণ,
সে অতলে গীতগান কিছু না বাজে।
যাও সব যাও ভুলে, নিখিল বন্ধন খুলে
ফেলে দিয়ে এসো কূলে সকল কাজে।
যদি মরণ লভিতে চাও এসো তবে ঝাঁপ দাও
সলিলমাঝে॥

১২ আষাঢ় ১৩০০

ব্যর্থ যৌবন

আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায়
কেমনে ?
কেন নয়নের জল ঝরিছে বিফল
নয়নে !
এ বেশভূষণ লহো সখী, লহো,
এ কুসুমমালা হয়েছে অসহ—
এমন যামিনী কাটিল বিরহ-
শয়নে।
আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায়
কেমনে ॥

আমি বৃথা অভিসারে এ যমুনাপারে
এসেছি।
বহি বৃথা মনো-আশা এত ভালোবাসা
বেসেছি।
শেষে নিশিশেষে বদন মলিন,
ক্লান্ত চরণ, মন উদাসীন—
ফিরিয়া চলেছি কোন্ সুখহীন
ভবনে !
হায়, যে রজনী যায় ফিরাইব তায়
কেমনে ॥

কত উঠেছিল চাঁদ নিশীথ-অগাধ
আকাশে !
বনে দুলেছিল ফুল গন্ধব্যাকুল
বাতাসে।
তরুমর্মর নদীকলতান
কানে লেগেছিল স্বপ্নসমান,
দূর হতে আসি পশেছিল গান
শ্রবণে।
আজি সে রজনী যায়, ফিরাইব তায়
কেমনে ॥

মনে লেগেছিল হেন আমারে সে যেন
ডেকেছে।
যেন চিরযুগ ধ'রে মোরে মনে ক'রে
রেখেছে।
সে আনিবে বহি ভরা অনুরাগ,
যৌবননদী করিবে সজাগ,
আসিবে নিশীথে, বাঁধিবে সোহাগ-
বাঁধনে।
আহা, সে রজনী যায়, ফিরাইব তায়
কেমনে ॥

ওগো, ভোলা ভালো তবে, কাঁদিয়া কী হবে
মিছে আর ?

যদি যেতে হল হায়, প্রাণ কেন চায়
পিছে আর?
কুঞ্জদুয়ারে অবোধের মতো
রজনীপ্রভাতে বসে রব কত!
এবারের মতো বসন্ত গত
জীবনে।
হায়, যে রজনী যায় ফিরাইব তায়
কেমনে॥

১৬ আষাঢ় ১৩০০

ভরা ভাদরে

নদী ভরা কূলে কূলে, খেতে ভরা ধান।
আমি ভাবিতেছি বসে কী গাহিব গান।
কেতকী জলের ধারে
ফুটিয়াছে ঝোপে ঝাড়ে,
নিরাকুল ফুলভারে
বকুল-বাগান।
কানায় কানায় পূর্ণ আমার পরান॥

ঝিলিমিলি করে পাতা, ঝিকিমিকি আলো;
আমি ভাবিতেছি কার আঁখিদুটি কালো।
কদম্ব গাছের সার
চিকন পল্লবে তার
গন্ধে-ভরা অন্ধকার
হয়েছে ঘোরালো।
কারে বলিবারে চাহি কারে বাসি ভালো॥

অম্লান উজ্জ্বল দিন, বৃষ্টি-অবসান।
আমি ভাবিতেছি আজি কী করিব দান।
মেঘখণ্ড থরে থরে
উদাস বাতাসভরে

নানা ঠাঁই ঘুরে মরে
হুতাশসমান।
সাধ যায় আপনারে করি শতখান॥

দিবস অবশ যেন হয়েছে আলসে।
আমি ভাবি আর-কেহ কী ভাবিছে বসে।
তরুশাখে হেলাফেলা
কামিনী ফুলের মেলা,
থেকে থেকে সারাবেলা
পড়ে খ'সে খ'সে।
কী বাঁশি বাজিছে সদা প্রভাতে প্রদোষে॥

পাখির প্রমোদগানে পূর্ণ বনস্থল।
আমি ভাবিতেছি চোখে কেন আসে জল।
দোয়েল দুলায়ে শাখা
গাহিছে অমৃত-মাখা,
নিভৃত পাতায় ঢাকা
কপোতযুগল।
আমারে সকলে মিলে করেছে বিকল॥

[সাজাদপুর]
২৭ আষাঢ় ১৩০০

প্রত্যাখ্যান

অমন দীন-নয়নে তুমি
চেয়ো না।
অমন সুধা-করুণ সুরে
গেয়ো না।
সকাল বেলা সকল কাজে
আসিতে যেতে পথের মাঝে
আমারি এই আঙিনা দিয়ে
যেয়ো না।
অমন দীন-নয়নে তুমি
চেয়ো না॥

মনের কথা রেখেছি মনে
যতনে,
ফিরিছ মিছে মাগিয়া সেই
রতনে।
তুচ্ছ অতি, কিছু সে নয়—
দু-চারি-ফোঁটা-অশ্রু-ময়
একটি শুধু শোণিত-রাঙা
বেদনা।

অমন দীন-নয়নে তুমি
চেয়ো না॥

কাহার আশে দুয়ারে কর
হানিছ?
না জানি তুমি কী মোরে মনে
মানিছ!
রয়েছি হেথা লুকাতে লাজ,
নাহিকো মোর রানীর সাজ,
পরিয়া আজি জীর্ণচীর
বাসনা।
অমন দীন-নয়নে তুমি
চেয়ো না॥

কী ধন তুমি এনেছ ভরি
দু হাতে।
অমন করি যেয়ো না ফেলি
ধুলাতে।
এ ঋণ যদি শুধিতে চাই
কী আছে হেন, কোথায় পাই—
জনম-তরে বিকাতে হবে
আপনা।
অমন দীন-নয়নে তুমি
চেয়ো না॥

ভেবেছি মনে, ঘরের কোণে
রহিব।
গোপন দুখ আপন বুকে
বহিব।
কিসের লাগি করিব আশা—
বলিতে চাহি, নাহিকো ভাষা ;
রয়েছে সাধ, না জানি তার
সাধনা।
অমন দীন-নয়নে তুমি
চেয়ো না॥

যে সুর তুমি ভরেছ তব
বাঁশিতে
উহার সাথে আমি কি পারি
গাহিতে ?
গাহিতে গেলে ভাঙিয়া গান
উছলি উঠে সকল প্রাণ,
না মানে রোধ অতি অবোধ
রোদনা।
অমন দীন-নয়নে তুমি
চেয়ো না॥

এসেছ তুমি গলায় মালা
ধরিয়া—

নবীন বেশ, শোভন ভূষা
      পরিয়া।
হেথায় কোথা কনকথালা,
কোথায় ফুল, কোথায় মালা—
বাসরসেবা করিবে কেবা
      রচনা ?
অমন দীন-নয়নে তুমি
      চেয়ো না॥

ভুলিয়া পথ এসেছ, সখা,
      এ ঘরে।
অন্ধকারে মালাবদল
      কে করে!
সন্ধ্যা হতে কঠিন ভুঁয়ে
একাকী আমি রয়েছি শুয়ে,
নিবায়ে দীপ জীবননিশি-
      যাপনা!
অমন দীন-নয়নে আর
      চেয়ো না॥

[সাজাদপুর]
২৭ আষাঢ় ১৩০০

লজ্জা

আমার হৃদয় প্রাণ
সকলি করেছি দান,
কেবল শরমখানি রেখেছি।
চাহিয়া নিজের পানে
নিশিদিন সাবধানে
সযতনে আপনারে ঢেকেছি॥

হে বঁধু, এ স্বচ্ছ বাস
করে মোরে পরিহাস,
সতত রাখিতে নারি ধরিয়া—
চাহিয়া আঁখির কোণে
তুমি হাস মনে মনে,
আমি তাই লাজে যাই মরিয়া॥

দক্ষিণপবনভরে
অঞ্চল উড়িয়া পড়ে
কখন যে, নাহি পারি লখিতে।
পুলকব্যাকুল হিয়া
অঙ্গে উঠে বিকশিয়া,
আবার চেতনা হয় চকিতে॥

বদ্ধ গৃহে করি বাস
রুদ্ধ যবে হয় শ্বাস
আধেক বসনবন্ধ খুলিয়া
বসি গিয়া বাতায়নে,
সুখসন্ধ্যাসমীরণে
ক্ষণতরে আপনারে ভুলিয়া ॥

পূর্ণচন্দ্রকররাশি
মূর্ছাতুর পড়ে আসি
এই নবযৌবনের মুকুলে,
অঙ্গ মোর ভালোবেসে
ঢেকে দেয় মৃদু হেসে
আপনার লাবণ্যের দুকূলে—

মুখে বক্ষে কেশপাশে
ফিরে বায়ু খেলা-আশে,
কুসুমের গন্ধ ভাসে গগনে—
হেনকালে তুমি এলে
মনে হয় স্বপ্ন ব'লে,
কিছু আর নাহি থাকে স্মরণে ॥

থাক্ বঁধু, দাও ছেড়ে,
ওটুকু নিয়ো না কেড়ে,
এ শরম দাও মোরে রাখিতে-

সকলের অবশেষ
এইটুকু লাজলেশ
আপনারে আধখানি ঢাকিতে ॥

ছলছল-দু'নয়ান
করিয়ো না অভিমান,
আমিও যে কত নিশি কেঁদেছি।
বুঝাতে পারি নে যেন
সব দিয়ে তবু কেন
সবটুকু লাজ দিয়ে বেঁধেছি—

কেন যে তোমার কাছে
একটু গোপন আছে,
একটু রয়েছি মুখ হেলায়ে।
এ নহে গো অবিশ্বাস—
নহে, সখা, পরিহাস,
নহে নহে ছলনার খেলা এ ॥

বসন্তনিশীথে, বঁধু,
লহো গন্ধ, লহো মধু,
সোহাগে মুখের পানে তাকিয়ো।
দিয়ো দোল আশে-পাশে,
কোয়ো কথা মৃদু ভাষে—
শুধু এর বৃন্তটুকু রাখিয়ো ॥

সেটুকুতে ভর করি
এমন মাধুরী ধরি
তোমাপানে আছি আমি ফুটিয়া,
এমন মোহনভঙ্গে
আমার সকল অঙ্গে
নবীন লাবণ্য যায় লুটিয়া—

এমন সকল বেলা
পবনে চঞ্চল খেলা,
বসন্তকুসুম-মেলা দু'ধারি।
শুন বঁধু, শুন তবে,
সকলি তোমার হবে,
কেবল শরম থাক্ আমারি।

২৮ আষাঢ় ১৩০০

পুরস্কার

সেদিন বরষা ঝরঝর ঝরে,
কহিল কবির স্ত্রী—
'রাশি রাশি মিল করিয়াছ জড়ো,
রচিতেছ বসি পুঁথি বড়ো বড়ো,
মাথার উপরে বাড়ি পড়ো-পড়ো
তার খোঁজ রাখ কি!
গাঁথিছ ছন্দ দীর্ঘ হ্রস্ব—
মাথা ও মুণ্ড, ছাই ও ভস্ম;
মিলিবে কি তাহে হস্তী অশ্ব,
না মিলে শস্যকণা।
অন্ন জোটে না, কথা জোটে মেলা,
নিশিদিন ধরে এ কী ছেলেখেলা!
ভারতীরে ছাড়ি ধরো এই বেলা
লক্ষ্মীর উপাসনা।
ওগো, ফেলে দাও পুঁথি ও লেখনী,
যা করিতে হয় করহ এখনি।
এত শিখিয়াছ, এটুকু শেখ নি
কিসে কড়ি আসে দুটো!'
দেখি সে মুরতি সর্বনাশিয়া
কবির পরান উঠিল ত্রাসিয়া,

পরিহাসছলে ঈষৎ হাসিয়া
কহে জুড়ি করপুট—
'ভয় নাহি করি ও মুখ-নাড়ারে,
লক্ষ্মী সদয় লক্ষ্মীছাড়ারে—
ঘরেতে আছেন নাইকো ভাঁড়ারে
এ কথা শুনিবে কেবা!
আমার কপালে বিপরীত ফল—
চপলা লক্ষ্মী মোরে অচপল,
ভারতী না থাকে থির এক পল
এত করি তাঁর সেবা।
তাই তো কপাটে লাগাইয়া খিল
স্বর্গে মর্তে খুঁজিতেছি মিল,
আনমনা যদি হই এক তিল
অমনি সর্বনাশ।'
মনে মনে হাসি মুখ করি ভার
কহে কবিজায়া, 'পারি নেকো আর,
ঘরসংসার গেল ছারেখার,
সব তাতে পরিহাস!'
এতেক বলিয়া বাঁকায়ে মুখানি
শিঞ্জিত করি কাঁকন দুখানি
চঞ্চল করে অঞ্চল টানি
রোষছলে যায় চলি।
হেরি সে ভুবন-গরব-দমন
অভিমানবেগে অধীর গমন

উচাটন, কবি কহিল, 'অমন
যেয়ো না হৃদয় দলি।
ধরা নাহি দিলে ধরিব দু পায়,
কী করিতে হবে বলো সে উপায়,
ঘর ভরি দিব সোনায় রুপায়—
বুদ্ধি জোগাও তুমি।
একটুকু ফাঁকা যেখানে যা পাই
তোমারি মুরতি সেখানে চাপাই,
বুদ্ধির চাষ কোনোখানে নাই—
সমস্ত মরুভূমি।'
'হয়েছে, হয়েছে, এত ভালো নয়'
হাসিয়া রুষিয়া গৃহিণী ভণয়,
'যেমন বিনয় তেমনি প্রণয়
আমার কপালগুণে।
কথার কখনো ঘটে নি অভাব,
যখনি বলেছি পেয়েছি জবাব ;
একবার, ওগো বাক্যনবাব,
চলো দেখি কথা শুনে।
শুভ দিনখন দেখো পাঁজি খুলি,
সঙ্গে করিয়া লহো পুঁথিগুলি,
ক্ষণিকের তরে আলস্য ভুলি
চলো রাজসভামাঝে।
আমাদের রাজা গুণীর পালক,
মানুষ হইয়া গেল কত লোক—

ঘরে তুমি জমা করিলে শোলোক
　　লাগিবে কিসের কাজে !'
কবির মাথায় ভাঙি পড়ে বাজ ;
ভাবিল, 'বিপদ দেখিতেছি আজ,
কখনো জানি নে রাজা-মহারাজ—
　　কপালে কী জানি আছে !'
মুখে হেসে বলে, 'এই বৈ নয় !
আমি বলি আরো কী করিতে হয়—
প্রাণ দিতে পারি, শুধু জাগে ভয়
　　বিধবা হইবে পাছে ।
যেতে যদি হয় দেরিতে কী কাজ !
ত্বরা ক'রে তবে নিয়ে এসো সাজ—
হেমকুণ্ডল, মণিময় তাজ,
　　কেয়ূর, কনকহার ।
বলে দাও মোর সারথিরে ডেকে
ঘোড়া বেছে নেয় ভালো ভালো দেখে,
কিংকরগণ সাথে যাবে কে কে
　　আয়োজন করো তার ।'
ব্রাহ্মণী কহে, 'মুখাগ্রে যার
বাধে না কিছুই কী চাহে সে আর,
মুখ ছুটাইলে রথাশ্বে তার
　　না দেখি আবশ্যক ।
নানা বেশভূষা হীরা রুপা সোনা
এনেছি পাড়ার করি উপাসনা—

সাজ করে লও পুরায়ে বাসনা,
রসনা ক্ষান্ত হোক।'
এতেক বলিয়া ত্বরিতচরণ
আনে বেশবাস নানান-ধরন ;
কবি ভাবে মুখ করি বিবরন,
'আজিকে গতিক মন্দ।'
গৃহিণী স্বয়ং নিকটে বসিয়া
তুলিল তাহারে মাজিয়া ঘষিয়া,
আপনার হাতে যতনে কষিয়া
পরাইল কটিবন্ধ।
উষ্ণীষ আনি মাথায় চড়ায়,
কণ্ঠী আনিয়া কণ্ঠে জড়ায়,
অঙ্গদ দুটি বাহুতে পরায়,
কুণ্ডল দেয় কানে।
অঙ্গে যতই চাপায় রতন
কবি বসি থাকে ছবির মতন,
প্রেয়সীর নিজ হাতের যতন
সেও আজি হার মানে।
এইমতে দুই প্রহর ধরিয়া
বেশভূষা সব সমাধা করিয়া
গৃহিণী নিরখে ঈষৎ সরিয়া
বাঁকায়ে মধুর গ্রীবা।
হেরিয়া কবির গম্ভীর মুখ
হৃদয়ে উপজে মহা কৌতুক—

হাসি উঠি কহে ধরিয়া চিবুক,
　　'আ মরি, সেজেছ কিবা!'
ধরিল সমুখে আরশি আনিয়া,
কহিল বচন অমিয় ছানিয়া,
'পুরনারীদের পরান হানিয়া
　　ফিরিয়া আসিবে আজি—
তখন দাসীরে ভুলো না গরবে,
এই উপকার মনে রেখো তবে,
মোরেও এমনি পরাইতে হবে
　　রতনভূষণরাজি।'
কোলের উপরে বসি', বাহুপাশে
বাঁধিয়া কবিরে সোহাগে সহাসে
কপোল রাখিয়া কপোলের পাশে
　　কানে কানে কথা কয়।
দেখিতে দেখিতে কবির অধরে
হাসিরাশি আর কিছুতে না ধরে,
মুগ্ধ হৃদয় গলিয়া আদরে
　　ফাটিয়া বাহির হয়।
কহে উচ্ছ্বসি, 'কিছু না মানিব,
এমনি মধুর শ্লোক বাখানিব
রাজভাণ্ডার টানিয়া আনিব
　　ও রাঙা চরণতলে।'
বলিতে বলিতে বুক উঠে ফুলি,
উষ্ণীষ-পরা মস্তক তুলি

পথে বাহিরায় গৃহদ্বার খুলি—
দ্রুত রাজগৃহে চলে।
কবির রমণী কুতূহলে ভাসে,
তাড়াতাড়ি উঠি বাতায়নপাশে
উঁকি মারি চায়, মনে মনে হাসে—
কালো চোখে আলো নাচে।
কহে মনে মনে বিপুলপুলকে,
'রাজপথ দিয়ে চলে এত লোকে,
এমনটি আর পড়িল না চোখে
আমার যেমন আছে।'

এ দিকে কবির উৎসাহ ক্রমে
নিমেষে নিমেষে আসিতেছে কমে,
যখন পশিল নৃপ-আশ্রমে
মরিতে পাইলে বাঁচে।
রাজসভাসদ্ সৈন্য পাহারা
গৃহিণীর মতো নহে তো তাহারা,
সারি সারি দাড়ি করে দিশাহারা—
হেথা কি আসিতে আছে!
হেসে ভালোবেসে দুটো কথা কয়
রাজসভাগৃহ হেন ঠাঁই নয়,
মন্ত্রী হইতে দ্বারীমহাশয়
সবে গম্ভীরমুখ।

মানুষে কেন যে মানুষের প্রতি
ধরি আছে হেন যমের মুরতি
তাই ভাবি কবি না পায় ফুরতি,
দমে যায় তার বুক।
বসি মহারাজ মহেন্দ্ররায়
মহোচ্চ গিরি-শিখরের প্রায়,
জন-অরণ্য হেরিছে হেলায়
অচল-অটল-ছবি।
কৃপানির্ঝর পড়িছে ঝরিয়া
শত শত দেশ সরস করিয়া,
সে মহামহিমা নয়ন ভরিয়া
চাহিয়া দেখিল কবি।
বিচার সমাধা হল যবে, শেষে
ইঙ্গিত পেয়ে মন্ত্রী-আদেশে
জোড়করপুটে দাঁড়াইল এসে
দেশের প্রধান চর।
অতি সাধুমত আকারপ্রকার,
এক তিল নাহি মুখের বিকার,
ব্যবসা যে তাঁর মানুষশিকার
নাহি জানে কোনো নর।
ব্রত নানামত সতত পালয়ে,
এক কানাকড়ি মূল্য না লয়ে
ধর্মোপদেশ আলয়ে আলয়ে
বিতরিছে যাকে তাকে।

চোরা কটাক্ষ চক্ষে ঠিকরে—
কী ঘটিছে কার, কে কোথা কী করে,
পাতায় পাতায় শিকড়ে শিকড়ে
সন্ধান তার রাখে।
নামাবলী গায়ে বৈষ্ণবরূপে
যখন সে আসি প্রণমিল ভূপে
মন্ত্রী রাজারে অতি চুপে চুপে
কী করিল নিবেদন।
অমনি আদেশ হইল রাজার,
'দেহো এঁরে টাকা পঞ্চ হাজার।'
'সাধু সাধু' কহে সভার মাঝার
যত সভাসদ্‌জন।
পুলক প্রকাশে সবার গাত্রে—
'এ-যে দান ইহা যোগ্য পাত্রে,
দেশের আবাল-বনিতা-মাত্রে
ইথে না মানিবে দ্বেষ।'
সাধু নুয়ে পড়ে নম্রতাভরে,
দেখি সভাজন আহা-আহা করে,
মন্ত্রীর শুধু জাগিল অধরে
ঈষৎ হাস্যলেশ।
আসে গুটি গুটি বৈয়াকরণ
ধূলি-ভরা দুটি লইয়া চরণ
চিহ্নিত করি রাজাস্তরণ
পবিত্র পদপঙ্কে।

ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম,
বলি-অঙ্কিত শিথিল চর্ম,
প্রখরমূর্তি অগ্নিশর্ম—
ছাত্র মরে আতঙ্কে।
কোনো দিকে কোনো লক্ষ না ক'রে
পড়ি গেল শ্লোক বিকট হাঁ ক'রে,
মটর-কড়াই মিশায়ে কাঁকরে
চিবাইল যেন দাঁতে।
কেহ তার নাহি বুঝে আগুপিছু,
সবে বসি থাকে মাথা করি নিচু ;
রাজা বলে, 'এঁরে দক্ষিণা কিছু
দাও দক্ষিণ হাতে।'
তার পরে এল গনৎকার,
গণনায় রাজা চমৎকার,
টাকা ঝন্ ঝন্ ঝনৎকার
বাজায়ে সে গেল চলি।
আসে এক বুড়া গণ্যমান্য
করপুটে লয়ে দূর্বাধান্য,
রাজা তাঁর প্রতি অতি বদান্য
ভরিয়া দিলেন থলি।
আসে নট ভাট রাজপুরোহিত,
কেহ একা কেহ শিষ্য-সহিত,
কারো বা মাথায় পাগড়ি লোহিত
কারো বা হরিৎবর্ণ।

আসে দ্বিজগণ পরমারাধ্য ;
কন্যার দায়, পিতার শ্রাদ্ধ—
যার যথামত পায় বরাদ্দ,
রাজা আজি দাতাকর্ণ।
যে যাহার সবে যায় স্বভবনে,
কবি কী করিবে ভাবে মনে মনে,
রাজা দেখে তারে সভাগৃহকোণে
বিপন্নমুখছবি।
কহে ভূপ, 'হোথা বসিয়া কে ওই,
এসো তো মন্ত্রী, সন্ধান লই।'
কবি কহি উঠে, 'আমি কেহ নই,
আমি শুধু এক কবি।'
রাজা কহে, 'বটে! এসো এসো তবে,
আজিকে কাব্য-আলোচনা হবে।'
বসাইলা কাছে মহাগৌরবে
ধরি তার কর দুটি।
মন্ত্রী ভাবিল, 'যাই এই বেলা,
এখন তো শুরু হবে ছেলেখেলা।'
কহে, 'মহারাজ, কাজ আছে মেলা,
আদেশ পাইলে উঠি।'
রাজা শুধু মৃদু নাড়িলা হস্ত,
নৃপ-ইঙ্গিতে মহা তটস্থ
বাহির হইয়া গেল সমস্ত
সভাস্থ দলবল—

পাত্র মিত্র অমাত্য আদি
অর্থী প্রার্থী বাদী প্রতিবাদী
উচ্চ তুচ্ছ বিবিধ উপাধি
বন্যার যেন জল ॥

চলি গেল যবে সভ্যসুজন
মুখোমুখি করি বসিলা দুজন,
রাজা বলে, 'এবে কাব্যকূজন
আরম্ভ করো কবি।'
কবি তবে দুই কর জুড়ি বুকে
বাণীবন্দনা করে নতমুখে—
'প্রকাশো জননী, নয়নসমুখে
প্রসন্নমুখছবি।
বিমলমানসসরসবাসিনী,
শুক্লবসনা শুভ্রহাসিনী,
বীণাগঞ্জিতমঞ্জুভাষিণী
কমলকুঞ্জাসনা,
তোমারে হৃদয়ে করিয়া আসীন
সুখে গৃহকোণে ধনমানহীন
খ্যাপার মতন আছি চিরদিন
উদাসীন আনমনা।
চারি দিকে সবে বাঁটিয়া দুনিয়া
আপন অংশ নিতেছে গুনিয়া—

আমি তব স্নেহবচন শুনিয়া
　　পেয়েছি স্বরগসুধা।
সেই মোর ভালো, সেই বহু মানি—
তবু মাঝে মাঝে কেঁদে ওঠে প্রাণী;
সুরের খাদ্যে জান তো, মা বাণী,
　　নরের মিটে না ক্ষুধা।
যা হবার হবে, সে কথা ভাবি না,
মা গো, একবার ঝংকারো বীণা,
ধরহ রাগিণী বিশ্বপ্লাবিনী
　　অমৃত-উৎস-ধারা—
যে রাগিণী শুনি নিশিদিনমান
বিপুল হর্ষে দ্রব ভগবান
মলিন মর্ত-মাঝে বহমান
　　নিয়ত আত্মহারা।
যে রাগিণী সদা গগন ছাপিয়া
হোমশিখাসম উঠিছে কাঁপিয়া,
অনাদি অসীমে পড়িছে ঝাঁপিয়া
　　বিশ্বতন্ত্রী হতে।
যে রাগিণী চির-জন্ম ধরিয়া
চিত্তকুহরে উঠে কুহরিয়া,
অশ্রুহাসিতে জীবন ভরিয়া
　　ছুটে সহস্র স্রোতে।
কে আছে কোথায়, কে আসে কে যায়,
নিমেষে প্রকাশে, নিমেষে মিলায়—

বালুকার 'পরে কালের বেলায়
ছায়া-আলোকের খেলা !
জগতের যত রাজা মহারাজ
কাল ছিল যারা কোথা তারা আজ—
সকালে ফুটিছে সুখ দুখ লাজ,
টুটিছে সন্ধ্যাবেলা।
শুধু তার মাঝে ধ্বনিতেছে সুর
বিপুল বৃহৎ গভীর মধুর—
চিরদিন তাহে আছে ভরপুর,
মগন গগনতল।
যে জন শুনেছে সে অনাদি ধ্বনি
ভাসায়ে দিয়েছে হৃদয়তরণী ;
জানে না আপনা, জানে না ধরণী,
সংসারকোলাহল।
সে জন পাগল, পরান বিকল—
ভবকূল হতে ছিঁড়িয়া শিকল
কেমনে এসেছে ছাড়িয়া সকল,
ঠেকেছে চরণে তব।
তোমার অমল কমলগন্ধ
হৃদয়ে ঢালিছে মহা-আনন্দ ;
অপূর্ব গীত, অলোক ছন্দ,
শুনিছে নিত্যনব।
বাজুক সে বীণা, মজুক ধরণী ;
বারেকের তরে ভুলাও, জননী,

কে বড়ো কে ছোটো, কে দীন কে ধনী,
কেবা আগে কেবা পিছে—
কার জয় হল কার পরাজয়,
কাহার বৃদ্ধি কার হল ক্ষয়,
কেবা ভালো আর কেবা ভালো নয়,
কে উপরে কেবা নীচে।
গাঁথা হয়ে যাক এক গীতরবে
ছোটো জগতের ছোটো-বড়ো সবে—
সুখে প'ড়ে রবে পদপল্লবে
যেন মালা একখানি।
তুমি মানসের মাঝখানে আসি
দাঁড়াও মধুর মুরতি বিকাশি
কুন্দবরন-সুন্দর-হাসি,
বীণা হাতে বীণাপাণি।
ভাসিয়া চলিবে রবি শশী তারা
সারি সারি যত মানবের ধারা
অনাদি কালের পান্থ যাহারা
তব সংগীতস্রোতে।
দেখিতে পাইব ব্যোমে মহাকাল
ছন্দে ছন্দে বাজাইছে তাল,
দশ দিক্‌বধূ খুলি কেশজাল
নাচে দশ দিক হতে।'

এতেক বলিয়া ক্ষণপরে কবি
করুণ কথায় প্রকাশিল ছবি
পুণ্যকাহিনী রঘুকুলরবি
রাঘবের ইতিহাস—
অসহ দুঃখ সহি নিরবধি
কেমনে জনম গিয়েছে দগধি,
জীবনের শেষ দিবস অবধি
অসীম নিরাশ্বাস।
কহিল, 'বারেক ভাবি দেখো মনে
সেই একদিন কেটেছে কেমনে
যে দিন মলিন বাকলবসনে
চলিলা বনের পথে—
ভাই লক্ষ্মণ বয়স নবীন,
ম্লানছায়াসম বিষাদবিলীন
নববধূ সীতা আভরণহীন
উঠিলা বিদায়রথে।
রাজপুরীমাঝে উঠে হাহাকার,
প্রজা কাঁদিতেছে পথে সারে সার—
এমন বজ্র কখনো কি আর
পড়েছে এমন ঘরে!
অভিষেক হবে, উৎসবে তার
আনন্দময় ছিল চারি ধার—
মঙ্গলদীপ নিবিয়া আঁধার
শুধু নিমেষের ঝড়ে।

আর এক দিন, ভেবে দেখো মনে,
যে দিন শ্রীরাম লয়ে লক্ষ্মণে
ফিরিয়া নিভৃত কুটিরভবনে
দেখিলা জানকী নাহি—
'জানকী জানকী' আর্ত রোদনে
ডাকিয়া ফিরিলা কাননে কাননে,
মহা-অরণ্য আঁধার আননে
রহিল নীরবে চাহি।
তার পরে দেখো শেষ কোথা এর,
ভেবো দেখো কথা সেই দিবসের—
এত বিষাদের, এত বিরহের,
এত সাধনের ধন,
সেই সীতাদেবী রাজসভামাঝে
বিদায়বিনয়ে নমি রঘুরাজে
দ্বিধা ধরাতলে অভিমানে লাজে
হইলা অদর্শন।
সে-সকল দিন সেও চলে যায়—
সে অসহ শোক, চিহ্ন কোথায়—
যায় নি তো এঁকে ধরণীর গায়
অসীম দগ্ধ রেখা।
দ্বিধা ধরাভূমি জুড়েছে আবার,
দণ্ডকবনে ফুটে ফুলভার,
সরযুর কূলে দুলে তৃণসার
প্রফুল্ল শ্যামলেখা।

শুধু সে দিনের একখানি সুর
চিরদিন ধরে বহু বহু দূর
কাঁদিয়া হৃদয় করিছে বিধুর
মধুর করুণ তানে,
সে মহাপ্রাণের মাঝখানটিতে
যে মহারাগিণী আছিল ধ্বনিতে
আজিও সে গীত মহাসংগীতে
বাজে মানবের কানে।'

তার পরে কবি কহিল সে কথা,
কুরুপাণ্ডবসমর-বারতা—
'গৃহবিবাদের ঘোর মত্ততা
ব্যাপিল সর্ব দেশ;
দুইটি যমজ তরু পাশাপাশি,
ঘর্ষণে জ্বলে হুতাশনরাশি,
মহাদাবানল ফেলে শেষে গ্রাসি
অরণ্যপরিবেশ।
এক গিরি হতে দুই স্রোত-পারা
দুইটি শীর্ণ বিদ্বেষধারা
সরীসৃপগতি মিলিল তাহারা
নিষ্ঠুর অভিমানে—
দেখিতে দেখিতে হল উপনীত
ভারতের যত ক্ষত্রশোণিত—

ত্রাসিত ধরণী করিল ধ্বনিত
প্রলয়বন্যাগানে।
দেখিতে দেখিতে ডুবে গেল কূল,
আত্ম ও পর হয়ে গেল ভুল,
গৃহবন্ধন করি নির্মূল,
ছুটিল রক্তধারা ;
ফেনায়ে উঠিল মরণাম্বুধি,
বিশ্ব রহিল নিশ্বাস রুধি,
কাঁপিল গগন শত আঁখি মুদি
নিবায়ে সূর্য তারা।
সমরবন্যা যবে অবসান
সোনার ভারত বিপুল শ্মশান,
রাজগৃহ যত ভূতলশয়ান
পড়ে আছে ঠাঁই ঠাঁই—
ভীষণা শান্তি রক্তনয়নে
বসিয়া শোণিতপঙ্কশয়নে
চাহি ধরাপানে আনত বয়নে—
মুখেতে বচন নাই।
বহু দিন পরে ঘুচিয়াছে খেদ,
মরণে মিটেছে সব বিচ্ছেদ,
সমাধা যজ্ঞ মহানরমেধ
বিদ্বেষহুতাশনে।
সকল কামনা করিয়া পূর্ণ
সকল দম্ভ করিয়া চূর্ণ

পাঁচ ভাই গিয়া বসিলা শূন্য
স্বর্ণসিংহাসনে।
স্তব্ধ প্রাসাদ বিষাদ-আঁধার,
শ্মশান হইতে আসে হাহাকার
রাজপুরবধূ যত অনাথার
মর্ম্মবিদার রব।
'জয় জয় জয় পাণ্ডুতনয়'
সারি সারি দ্বারী দাঁড়াইয়া কয়;
পরিহাস ব'লে আজি মনে হয়,
মিছে মনে হয় সব।
কালি যে ভারত সারা দিন ধরি
অট্ট গরজে অম্বর ভরি
রাজার রক্তে খেলেছিল হোরি
ছাড়ি কুলভয়লাজে,
পরদিনে চিতাভস্ম মাখিয়া
সন্ন্যাসীবেশে অঙ্গ ঢাকিয়া
বসি একাকিনী শোকার্তহিয়া
শূন্যশ্মশানমাঝে।
কুরুপাণ্ডব মুছে গেছে সব,
সে রণরঙ্গ হয়েছে নীরব,
সে চিতাবহ্নি অতি ভৈরব
ভস্মও নাহি তার;
যে ভূমি লইয়া এত হানাহানি
সে আজি কাহার তাহাও না জানি—

কোথা ছিল রাজা, কোথা রাজধানী,
　　চিহ্ন নাহিকো আর।
তবু কোথা হতে আসিছে সে স্বর—
যেন সে অমর সমরসাগর
গ্রহণ করেছে নব কলেবর
　　একটি বিরাট গানে ;
বিজয়ের শেষে সে মহাপ্রয়াণ
সফল আশার বিষাদ মহান
উদাস শান্তি করিতেছে দান
　　চিরমানবের প্রাণে ॥

'হায়, এ ধরায় কত অনন্ত
বরষে বরষে শীত বসন্ত
সুখে দুখে ভরি দিক্‌দিগন্ত
　　হাসিয়া গিয়াছে ভাসি ;
এমনি বরষা আজিকার মতো
কত দিন কত হয়ে গেছে গত,
নব মেঘভারে গগন আনত
　　ফেলেছে অশ্রুরাশি।
যুগে যুগে লোক গিয়েছে এসেছে,
দুখীরা কেঁদেছে, সুখীরা হেসেছে,
প্রেমিক যে জন ভালো সে বেসেছে
　　আজি আমাদেরই মতো—

তারা গেছে, শুধু তাহাদের গান
দু হাতে ছড়ায়ে করে গেছে দান ;
দেশে দেশে, তার নাহি পরিমাণ,
ভেসে ভেসে যায় কত।
শ্যামলা বিপুলা এ ধরার পানে
চেয়ে দেখি আমি মুগ্ধ নয়ানে ;
সমস্ত প্রাণে কেন যে কে জানে
ভরে আসে আঁখিজল—
বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা,
বহু দিবসের সুখে দুখে আঁকা,
লক্ষ যুগের সংগীতে মাখা
সুন্দর ধরাতল।
এ ধরার মাঝে তুলিয়া নিনাদ
চাহি নে করিতে বাদ প্রতিবাদ,
যে কদিন আছি মানসের সাধ
মিটাব আপন মনে—
যার যাহা আছে তার থাক্ তাই,
কারো অধিকারে যেতে নাহি চাই
শান্তিতে যদি থাকিবারে পাই
একটি নিভৃত কোণে।
শুধু বাঁশিখানি হাতে দাও তুলি,
বাজাই বসিয়া প্রাণমন খুলি,
পুষ্পের মতো সংগীতগুলি
ফুটাই আকাশভালে—

অন্তর হতে আহরি বচন
আনন্দলোক করি বিরচন,
গীতরসধারা করি সিঞ্চন
সংসারধূলিজালে।
অতিদুর্গম সৃষ্টিশিখরে
অসীম কালের মহাকন্দরে
সতত বিশ্বনির্ঝর ঝরে
ঝর্ঝরসংগীতে,
স্বরতরঙ্গ যত গ্রহ তারা
ছুটিছে শূন্যে উদ্দেশহারা—
সেথা হতে টানি লব গীতধারা
ছোটো এই বাঁশরিতে।
ধরণীর শ্যাম করপুটখানি
ভরি দিব আমি সেই গীত আনি,
বাতাসে মিশায়ে দিব এক বাণী
মধুর-অর্থ-ভরা।
নবীন আষাঢ়ে রচি নব মায়া
এঁকে দিয়ে যাব ঘনতর ছায়া,
করে দিয়ে যাব বসন্তকায়া
বাসন্তীবাস-পরা।
ধরণীর তলে, গগনের গায়,
সাগরের জলে, অরণ্যছায়
আরেকটুখানি নবীন আভায়
রঙিন করিয়া দিব।

সংসারমাঝে দু-একটি সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর,
দু-একটি কাঁটা করি দিব দূর—
তার পরে ছুটি নিব।
সুখহাসি আরো হবে উজ্জ্বল,
সুন্দর হবে নয়নের জল,
স্নেহসুধামাখা বাসগৃহতল
আরো আপনার হবে।
প্রেয়সী নারীর নয়নে অধরে
আরেকটু মধু দিয়ে যাব ভরে,
আরেকটু স্নেহ শিশুমুখ-'পরে
শিশিরের মতো রবে।
না পারে বুঝাতে, আপনি না বুঝে
মানুষ ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে,
কোকিল যেমন পঞ্চমে কূজে
মাগিছে তেমনি সুর—
কিছু ঘুচাইব সেই ব্যাকুলতা,
কিছু মিটাইব প্রকাশের ব্যথা,
বিদায়ের আগে দু-চারিটা কথা
রেখে যাব সুমধুর।
থাকো হৃদাসনে জননী ভারতী—
তোমারি চরণে প্রাণের আরতি,
চাহি না চাহিতে আর কারো প্রতি,
রাখি না কাহারো আশা॥

কত সুখ ছিল, হয়ে গেছে দুখ—
কত বান্ধব হয়েছে বিমুখ,
ম্লান হয়ে গেছে কত উৎসুক
উন্মুখ ভালোবাসা।
শুধু ও চরণ হৃদয়ে বিরাজে,
শুধু ওই বীণা চিরদিন বাজে,
স্নেহসুরে ডাকে অন্তরমাঝে—
আয় রে বৎস, আয়,
ফেলে রেখে আয় হাসিক্রন্দন,
ছিঁড়ে আয় যত মিছে বন্ধন,
হেথা ছায়া আছে চিরনন্দন
চিরবসন্তবায়।
সেই ভালো মা গো, যাক যাহা যায়,
জন্মের মতো বরিনু তোমায়,
কমলগন্ধ কোমল দু পায়
বার বার নমো নম।'

এত বলি কবি থামাইল গান,
বসিয়া রহিল মুগ্ধনয়ান,
বাজিতে লাগিল হৃদয় পরান
বীণাঝংকারসম।
পুলকিত রাজা, আঁখি ছলছল্‌,
আসন ছাড়িয়া নামিলা ভূতল—

দু বাহু বাড়ায়ে পরান-উতল
  কবিরে লইলা বুকে।
কহিলা, 'ধন্য, কবি গো, ধন্য—
আনন্দে মন সমাচ্ছন্ন,
তোমারে কী আমি কহিব অন্য,
  চিরদিন থাকো সুখে।
ভাবিয়া না পাই কী দিব তোমারে,
করি পরিতোষ কোন্ উপহারে,
যাহা-কিছু আছে রাজভাণ্ডারে
  সব দিতে পারি আনি।'
প্রেমোচ্ছ্বসিত আনন্দজলে
ভরি দু নয়ন কবি তাঁরে বলে,
'কণ্ঠ হইতে দেহো মোর গলে
  ওই ফুলমালাখানি।'

মালা বাঁধি কেশে কবি যায় পথে—
কেহ শিবিকায় কেহ ধায় রথে,
নানা দিকে লোক যায় নানা মতে
  কাজের অন্বেষণে।
কবি নিজমনে ফিরিছে লুব্ধ,
যেন সে তাহার নয়ন মুগ্ধ
কল্পধেনুর অমৃতদুগ্ধ
  দোহন করিছে মনে

কবির রমণী বাঁধি কেশপাশ
সন্ধ্যার মতো পরি রাঙা বাস
বসি একাকিনী বাতায়নপাশ,
স্থখহাস মুখে ফুটে।
কপোতের দল চারি দিকে ঘিরে
নাচিয়া ডাকিয়া বেড়াইছে ফিরে,
যবের কণিকা তুলিয়া সে ধীরে
দিতেছে চঞ্চুপুটে।
অঙ্গুলি তার চলিছে যেমন
কত কী-যে কথা ভাবিতেছে মন,
হেনকালে পথে ফেলিয়া নয়ন
সহসা কবিরে হেরি
বাহুখানি নাড়ি মৃদু ঝিনিঝিনি
বাজাইয়া দিল করকিঙ্কিণী,
হাসিজালখানি অতুলহাসিনী
ফেলিলা কবিরে ঘেরি।
কবির চিত্ত উঠে উল্লাসি,
অতি সত্বর সম্মুখে আসি
কহে কৌতুকে মৃদু মৃদু হাসি,
'দেখো কী এনেছি বালা!
নানা লোকে নানা পেয়েছে রতন,
আমি আনিয়াছি করিয়া যতন
তোমার কণ্ঠে দেবার মতন
রাজকণ্ঠের মালা।'

এত বলি মালা শির হতে খুলি
প্রিয়ার গলায় দিতে গেল তুলি—
কবিনারী রোষে কর দিল ঠেলি,
ফিরায়ে রহিল মুখ।
মিছে ছল করি মুখে করে রাগ,
মনে মনে তার জাগিছে সোহাগ,
গরবে ভরিয়া উঠে অনুরাগ—
হৃদয়ে উথলে সুখ।
কবি ভাবে, 'বিধি অপ্রসন্ন,
বিপদ আজিকে হেরি আসন্ন।'
বসি থাকে মুখ করি বিষণ্ণ
শূন্যে নয়ন মেলি।
কবির ললনা আধখানি বেঁকে
চোরা কটাক্ষে চাহে থেকে থেকে—
পতির মুখের ভাবখানা দেখে
মুখের বসন ফেলি
উচ্চকণ্ঠে উঠিল হাসিয়া,
তুচ্ছ ছলনা গেল সে ভাসিয়া,
চকিতে সরিয়া নিকটে আসিয়া
পড়িল তাহার বুকে—
সেথায় লুকায়ে হাসিয়া কাঁদিয়া
কবির কণ্ঠ বাহুতে বাঁধিয়া
শতবার করি আপনি সাধিয়া
চুম্বিল তার মুখে।

বিস্মিত কবি বিহ্বলপ্রায়
আনন্দে কথা খুঁজিয়া না পায়—
মালাখানি লয়ে আপন গলায়
আদরে পরিলা সতী।
ভক্তি-আবেগে কবি ভাবে মনে
চেয়ে সেই প্রেমপূর্ণ বদনে—
বাঁধা প'ল এক মাল্যবাঁধনে
লক্ষ্মী সরস্বতী॥

সাহাজাদপুর
১৩ শ্রাবণ ১৩০০

বসুন্ধরা

আমারে ফিরায়ে লহো, অয়ি বসুন্ধরে,
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে
বিপুল অঞ্চলতলে। ওগো মা মৃন্ময়ী,
তোমার মৃত্তিকা-মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই ;
দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মতো ; বিদারিয়া
এ বক্ষপঞ্জর, টুটিয়া পাষাণবন্ধ
সংকীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ
অন্ধ কারাগার, হিল্লোলিয়া, মর্মরিয়া,
কম্পিয়া, স্খলিয়া, বিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া,
শিহরিয়া, সচকিয়া আলোকে পুলকে
প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভূলোকে
প্রান্ত হতে প্রান্তভাগে, উত্তরে দক্ষিণে,
পুরবে পশ্চিমে— শৈবালে শাদ্বলে তৃণে
শাখায় বল্কলে পত্রে উঠি সরসিয়া
নিগূঢ় জীবনরসে ; যাই পরশিয়া
স্বর্ণশীর্ষে-আনমিত শস্যক্ষেত্রতল
অঙ্গুলির আন্দোলনে ; নবপুষ্পদল
করি পূর্ণ সংগোপনে সুবর্ণলেখায়
সুধাগন্ধে মধুবিন্দুভারে ; নীলিমায়
পরিব্যাপ্ত করি দিয়া মহাসিন্ধুনীর
তীরে তীরে করি নৃত্য স্তব্ধ ধরণীর

অনন্ত কল্লোলগীতে ; উল্লসিত রঙ্গে
ভাষা প্রসারিয়া দিই তরঙ্গে তরঙ্গে
দিক্‌-দিগন্তরে ; শুভ্র উত্তরীয়-প্রায়
শৈলশৃঙ্গে বিছাইয়া দিই আপনায়
নিষ্কলঙ্ক নীহারের উত্তুঙ্গ নির্জনে
নিঃশব্দ নিভৃতে ॥

যে ইচ্ছা গোপনে মনে
উৎসসম উঠিতেছে অজ্ঞাতে আমার
বহুকাল ধ'রে, হৃদয়ের চারি ধার
ক্রমে পরিপূর্ণ করি বাহিরিতে চাহে
উদ্‌বেল উদ্দাম মুক্ত উদার প্রবাহে
সিঞ্চিতে তোমায়— ব্যথিত সে বাসনারে
বন্ধমুক্ত করি দিয়া শতলক্ষ ধারে
দেশে দেশে দিকে দিকে পাঠাব কেমনে
অন্তর ভেদিয়া ! বসি শুধু গৃহকোণে
লুব্ধচিত্তে করিতেছি সদা অধ্যয়ন,
দেশে দেশান্তরে কারা করেছে ভ্রমণ
কৌতূহলবশে ; আমি তাহাদের সনে
করিতেছি তোমারে বেষ্টন মনে মনে
কল্পনার জালে ॥

সুদুর্গম দূরদেশ—
পথশূন্য তরুশূন্য প্রান্তর অশেষ,

মহাপিপাসার রঙ্গভূমি ; রৌদ্রালোকে
জ্বলন্ত বালুকারাশি স্থচি বিঁধে চোখে ;
দিগন্তবিস্তৃত যেন ধূলিশয্যা-'পরে
জ্বরাতুরা বসুন্ধরা লুটাইছে পড়ে
তপ্তদেহ, উষ্ণশ্বাস বহ্নিজ্বালাময়,
শুষ্ককণ্ঠ, সঙ্গহীন, নিঃশব্দ, নির্দয়।
কত দিন গৃহপ্রান্তে বসি বাতায়নে
দূর দূরান্তের দৃশ্য আঁকিয়াছি মনে
চাহিয়া সম্মুখে ; চারি দিকে শৈলমালা,
মধ্যে নীল সরোবর নিস্তব্ধ নিরালা
স্ফটিকনির্মল স্বচ্ছ ; খণ্ড মেঘগণ
মাতৃস্তনপানরত শিশুর মতন
পড়ে আছে শিখর আঁকড়ি ; হিমরেখা
নীল গিরিশ্রেণী-'পরে দূরে যায় দেখা
দৃষ্টি রোধ করি ; যেন নিশ্চল নিষেধ
উঠিয়াছে সারি সারি স্বর্গ করি ভেদ
যোগমগ্ন ধূর্জটির তপোবনদ্বারে।
মনে মনে ভ্রমিয়াছি দূর সিন্ধুপারে
মহামেরুদেশে— যেখানে লয়েছে ধরা
অনন্তকুমারীব্রত, হিমবস্ত্র পরা,
নিঃসঙ্গ, নিঃস্পৃহ, সর্ব-আভরণ-হীন ;
যেথা দীর্ঘরাত্রিশেষে ফিরে আসে দিন
শব্দশূন্য সংগীতবিহীন ; রাত্রি আসে,
ঘুমাবার কেহ নাই, অনন্ত আকাশে

অনিমেষ জেগে থাকে নিদ্রাতন্দ্রাহত
শূন্যশয্যা মৃতপুত্রা জননীর মতো।
নূতন দেশের নাম যত পাঠ করি,
বিচিত্র বর্ণনা শুনি, চিত্ত অগ্রসরি
সমস্ত স্পর্শিতে চাহে— সমুদ্রের তটে
ছোটো ছোটো নীলবর্ণ পর্বতসংকটে
একখানি গ্রাম, তীরে শুকাইছে জাল,
জলে ভাসিতেছে তরী, উড়িতেছে পাল,
জেলে ধরিতেছে মাছ, গিরিমধ্যপথে
সংকীর্ণ নদীটি চলি আসে কোনোমতে
আঁকিয়া-বাঁকিয়া ; ইচ্ছা করে সে নিভৃত
গিরিক্রোড়ে-সুখাসীন ঊর্মিমুখরিত
লোকনীড়খানি হৃদয়ে বেষ্টিয়া ধরি
বাহুপাশে। ইচ্ছা করে আপনার করি
যেখানে যা-কিছু আছে ; নদীস্রোতোনীরে
আপনারে গলাইয়া দুই তীরে তীরে
নব নব লোকালয়ে করে যাই দান
পিপাসার জল, গেয়ে যাই কলগান
দিবসে নিশীথে ; পৃথিবীর মাঝখানে
উদয়সমুদ্র হতে অস্তসিন্ধুপানে
প্রসারিয়া আপনারে, তুঙ্গ গিরিরাজি
আপনার সুদুর্গম রহস্যে বিরাজি,
কঠিন পাষাণক্রোড়ে তীব্র হিমবায়ে
মানুষ করিয়া তুলি লুকায়ে লুকায়ে

নব নব জাতি। ইচ্ছা করে মনে মনে—
স্বজাতি হইয়া থাকি সর্বলোকসনে
দেশে দেশান্তরে ; উষ্ট্রদুগ্ধ করি পান
মরুতে মানুষ হই আরবসন্তান
দুর্দম স্বাধীন ; তিব্বতের গিরিতটে,
নির্লিপ্তপ্রস্তরপুরীমাঝে, বৌদ্ধমঠে
করি বিচরণ। দ্রাক্ষাপায়ী পারসিক
গোলাপকাননবাসী, তাতার নির্ভীক
অশ্বারূঢ়, শিষ্টাচারী সতেজ জাপান,
প্রবীণ প্রাচীন চীন নিশিদিনমান
কর্ম-অনুরত— সকলের ঘরে ঘরে
জন্মলাভ করে লই হেন ইচ্ছা করে।
অরুগ্‌ণ বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্বরতা—
নাহি কোনো ধর্মাধর্ম, নাহি কোনো প্রথা,
নাহি কোনো বাধাবন্ধ, নাহি চিন্তাজ্বর,
নাহি কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব, নাহি ঘর-পর,
উন্মুক্ত জীবনস্রোত বহে দিনরাত
সম্মুখে আঘাত করি সহিয়া আঘাত
অকাতরে ; পরিতাপজর্জর পরানে
বৃথা ক্ষোভে নাহি চায় অতীতের পানে,
ভবিষ্যৎ নাহি হেরে মিথ্যা দুরাশায়—
বর্তমানতরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায়
নৃত্য করে চলে যায় আবেগে উল্লাসি—
উচ্ছৃঙ্খল সে জীবন সেও ভালোবাসি ;

কতবার ইচ্ছা করে সেই প্রাণঝড়ে
ছুটিয়া চলিয়া যাই পূর্ণপালভরে
লঘুতরীসম ॥

হিংস্র ব্যাঘ্র অটবীর
আপন প্রচণ্ড বলে প্রকাণ্ড শরীর
বহিতেছে অবহেলে ; দেহ দীপ্তোজ্জ্বল
অরণ্যমেঘের তলে প্রচ্ছন্ন-অনল
বজ্রের মতন, রুদ্র মেঘমন্দ্র স্বরে
পড়ে আসি অতর্কিত শিকারের 'পরে
বিদ্যুতের বেগে ; অনায়াস সে মহিমা,
হিংসাতীব্র সে আনন্দ, সে দৃপ্ত গরিমা—
ইচ্ছা করে একবার লভি তার স্বাদ।
ইচ্ছা করে বার বার মিটাইতে সাধ
পান করি বিশ্বের সকল পাত্র হতে
আনন্দমদিরাধারা নব নব স্রোতে ॥

হে সুন্দরী বসুন্ধরে, তোমাপানে চেয়ে
কতবার প্রাণ মোর উঠিয়াছে গেয়ে
প্রকাণ্ড উল্লাসভরে ; ইচ্ছা করিয়াছে—
সবলে আঁকড়ি ধরি এ বক্ষের কাছে
সমুদ্রমেখলা-পরা তব কটিদেশ ;
প্রভাতরৌদ্রের মতো অনন্ত অশেষ

ব্যাপ্ত হয়ে দিকে দিকে, অরণ্যে ভূধরে
কম্পমান পল্লবের হিল্লোলের ’পরে
করি নৃত্য সারাবেলা, করিয়া চুম্বন
প্রত্যেক কুসুমকলি, করি আলিঙ্গন
সঘন কোমল শ্যাম তৃণক্ষেত্রগুলি,
প্রত্যেক তরঙ্গ-’পরে সারা দিন দুলি
আনন্দদোলায় ; রজনীতে চুপে চুপে
নিঃশব্দচরণে বিশ্বব্যাপী নিদ্রা-রূপে
তোমার সমস্ত পশু-পক্ষীর নয়নে
অঙ্গুলি বুলায়ে দিই, শয়নে শয়নে
নীড়ে নীড়ে গৃহে গৃহে গুহায় গুহায়
করিয়া প্রবেশ, বৃহৎ অঞ্চল-প্রায়
আপনারে বিস্তারিয়া ঢাকি বিশ্বভূমি
সুস্নিগ্ধ আঁধারে ॥

আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের, তোমার মৃত্তিকা-সনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্তচরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনীদিন
যুগযুগান্তর ধরি আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্রফুলফল গন্ধরেণু। তাই আজি

কোনো দিন আনমনে বসিয়া একাকী
পদ্মাতীরে, সম্মুখে মেলিয়া মুগ্ধ আঁখি
সর্ব অঙ্গে সর্ব মনে অনুভব করি—
তোমার মৃত্তিকা-মাঝে কেমনে শিহরি
উঠিতেছে তৃণাঙ্কুর, তোমার অন্তরে
কী জীবনরসধারা অহর্নিশি ধ'রে
করিতেছে সঞ্চরণ, কুসুমমুকুল
কী অন্ধ-আনন্দ-ভরে ফুটিয়া আকুল
সুন্দর বৃন্তের মুখে, নব রৌদ্রালোকে
তরুলতাতৃণগুল্ম কী গূঢ় পুলকে
কী মূঢ় প্রমোদরসে উঠে হরষিয়া—
মাতৃস্তনপানশ্রান্ত পরিতৃপ্তহিয়া
সুখস্বপ্নহাস্যমুখ শিশুর মতন।
তাই আজি কোনাদিন শরৎকিরণ
পড়ে যবে পক্বশীর্ষ স্বর্ণক্ষেত্র-'পরে,
নারিকেল-দলগুলি কাঁপে বায়ুভরে
আলোকে ঝিকিয়া, জাগে মহাব্যাকুলতা—
মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা
মন যবে ছিল মোর সর্বব্যাপী হয়ে
জলে স্থলে, অরণ্যের পল্লবনিলয়ে,
আকাশের নীলিমায়। ডাকে যেন মোরে
অব্যক্ত আহ্বানরবে শতবার ক'রে
সমস্ত ভুবন ; সে বিচিত্র সে বৃহৎ
খেলাঘর হতে মিশ্রিতমর্মরবৎ

শুনিবারে পাই যেন চিরদিনকার
সঙ্গীদের লক্ষবিধ আনন্দখেলার
পরিচিত রব। সেথায় ফিরায়ে লহো
মোরে আরবার ; দূর করো সে বিরহ
যে বিরহ থেকে থেকে জেগে ওঠে মনে
হেরি যবে সম্মুখেতে সন্ধ্যার কিরণে
বিশাল প্রান্তর, যবে ফিরে গাভীগুলি
দূর গোষ্ঠে মাঠপথে উড়াইয়া ধূলি,
তরু-ঘেরা গ্রাম হতে উঠে ধূমলেখা
সন্ধ্যাকাশে ; যবে চন্দ্র দূরে দেয় দেখা
শ্রান্ত পথিকের মতো অতি ধীরে ধীরে
নদীপ্রান্তে জনশূন্য বালুকার তীরে,
মনে হয় আপনারে একাকী প্রবাসী
নির্বাসিত, বাহু বাড়াইয়া ধেয়ে আসি
সমস্ত বাহিরখানি লইতে অন্তরে—
এ আকাশ, এ ধরণী, এই নদী-'পরে
শুভ্র শান্ত সুপ্ত জ্যোৎস্নারাশি! কিছু নাহি
পারি পরশিতে, শুধু শূন্যে থাকি চাহি
বিষাদব্যাকুল। আমারে ফিরায়ে লহো
সেই সর্ব-মাঝে যেথা হতে অহরহ
অঙ্কুরিছে মুকুলিছে মুঞ্জরিছে প্রাণ
শতেক সহস্র রূপে, গুঞ্জরিছে গান
শতলক্ষ সুরে, উচ্ছ্বসি উঠিছে নৃত্য
অসংখ্য ভঙ্গিতে, প্রবাহি যেতেছে চিত্ত

ভাবস্রোতে, ছিদ্রে ছিদ্রে বাজিতেছে বেণু ;
দাঁড়ায়ে রয়েছ তুমি শ্যাম কল্পধেনু,
তোমারে সহস্র দিকে করিছে দোহন
তরুলতা পশুপক্ষী কত অগণন
তৃষিতপরানি যত ; আনন্দের রস
কত রূপে হতেছে বর্ষণ, দিক দশ
ধ্বনিছে কল্লোলগীতে। নিখিলের সেই
বিচিত্র আনন্দ যত এক মুহূর্তেই
একত্রে করিব আস্বাদন এক হয়ে
সকলের সনে। আমার আনন্দ লয়ে
হবে না কি শ্যামতর অরণ্য তোমার ?
প্রভাত-আলোক-মাঝে হবে না সঞ্চার
নবীন কিরণকম্প ? মোর মুগ্ধ ভাবে
আকাশধরণীতল আঁকা হয়ে যাবে
হৃদয়ের রঙে— যা দেখে কবির মনে
জাগিবে কবিতা, প্রেমিকের দু নয়নে
লাগিবে ভাবের ঘোর, বিহঙ্গের মুখে
সহসা আসিবে গান। সহস্রের সুখে
রঞ্জিত হইয়া আছে সর্বাঙ্গ তোমার
হে বসুধে— জীবস্রোত কত বারম্বার
তোমারে মণ্ডিত করি আপন জীবনে
গিয়েছে ফিরেছে, তোমার মৃত্তিকা-সনে
মিশায়েছে অন্তরের প্রেম, গেছে লিখে
কত লেখা, বিছায়েছে কত দিকে দিকে

ব্যাকুল প্রাণের আলিঙ্গন ; তারি সনে
আমার সমস্ত প্রেম মিশায়ে যতনে
তোমার অঞ্চলখানি দিব রাঙাইয়া
সজীব বরনে, আমার সকল দিয়া
সাজাব তোমারে। নদীজলে মোর গান
পাবে না কি শুনিবারে কোনো মুগ্ধ কান
নদীকূল হতে ? উষালোকে মোর হাসি
পাবে না কি দেখিবারে কোনো মর্তবাসী
নিদ্রা হতে উঠি ? আজ শতবর্ষ পরে
এ সুন্দর অরণ্যের পল্লবের স্তরে
কাঁপিবে না আমার পরান ? ঘরে ঘরে
কত শত নরনারী চিরকাল ধ'রে
পাতিবে সংসারখেলা, তাহাদের প্রেমে
কিছু কি রব না আমি ? আসিব না নেমে
তাদের মুখের 'পরে হাসির মতন,
তাদের সর্বাঙ্গ-মাঝে সরস যৌবন,
তাদের বসন্তদিনে অকস্মাৎ সুখ,
তাদের মনের কোণে নবীন উন্মুখ
প্রেমের অঙ্কুর-রূপে ? ছেড়ে দিবে তুমি
আমারে কি একেবারে ওগো মাতৃভূমি—
যুগযুগান্তের মহা মৃত্তিকাবন্ধন
সহসা কি ছিঁড়ে যাবে ? করিব গমন
ছাড়ি লক্ষ বরষের স্নিগ্ধ ক্রোড়খানি ?
চতুর্দিক হতে মোরে লবে না কি টানি

এই-সব তরুলতা গিরি নদী বন,
এই চিরদিবসের সুনীল গগন,
এ জীবনপরিপূর্ণ উদার সমীর,
জাগরণপূর্ণ আলো, সমস্ত প্রাণীর
অন্তরে অন্তরে গাঁথা জীবনসমাজ ?
ফিরিব তোমারে ঘিরি করিব বিরাজ
তোমার আত্মীয়-মাঝে ; কীট পশু পাখি
তরু গুল্ম লতা -রূপে বারম্বার ডাকি
আমারে লইবে তব প্রাণতপ্ত বুকে ;
যুগে যুগে জন্মে জন্মে স্তন দিয়ে মুখে
মিটাইবে জীবনের শতলক্ষ ক্ষুধা
শতলক্ষ আনন্দের স্তন্যরসসুধা
নিঃশেষে নিবিড় স্নেহে করাইয়া পান।
তার পরে ধরিত্রীর যুবক সন্তান
বাহিরিব জগতের মহাদেশ-মাঝে
অতি দূর দূরান্তরে জ্যোতিষ্কসমাজে
সুদুর্গম পথে। এখনো মিটে নি আশা,
এখনো তোমার স্তন-অমৃত-পিপাসা
মুখেতে রয়েছে লাগি, তোমার আনন
এখনো জাগায় চোখে সুন্দর স্বপন,
এখনো কিছুই তব করি নাই শেষ,
সকলই রহস্যপূর্ণ, নেত্র অনিমেষ
বিস্ময়ের শেষতল খুঁজে নাহি পায়,
এখনো তোমার বুকে আছি শিশুপ্রায়

মুখপানে চেয়ে। জননী, লহো গো মোরে
সঘনবন্ধন তব বাহুযুগে ধ'রে—
আমারে করিয়া লহো তোমার বুকের—
তোমার বিপুল প্রাণ বিচিত্র সুখের
উৎস উঠিতেছে যেথা সে গোপন পুরে
আমারে লইয়া যাও— রাখিয়ো না দূরে ॥

২৬ কার্তিক ১৩০০

মায়াবাদ

হা রে নিরানন্দ দেশ, পরি জীর্ণ জরা,
বহি বিজ্ঞতার বোঝা, ভাবিতেছ মনে—
ঈশ্বরের প্রবঞ্চনা পড়িয়াছে ধরা
সুচতুর সূক্ষ্মদৃষ্টি তোমার নয়নে !
লয়ে কুশাঙ্কুরবুদ্ধি শাণিতপ্রখরা
কর্মহীন রাত্রিদিন বসি গৃহকোণে
মিথ্যা ব'লে জানিয়াছ বিশ্ববসুন্ধরা—
গ্রহতারাময় সৃষ্টি অনন্ত গগনে।
যুগ যুগান্তর ধ'রে পশু পক্ষী প্রাণী
অচল নির্ভয়ে হেথা নিতেছে নিশ্বাস
বিধাতার জগতেরে মাতৃক্রোড় মানি ;
তুমি বৃদ্ধ কিছুরেই কর না বিশ্বাস !
লক্ষকোটি জীব লয়ে এ বিশ্বের মেলা ;
তুমি জানিতেছ মনে— সব ছেলেখেলা।

খেলা

হোক খেলা, এ খেলায় যোগ দিতে হবে
আনন্দকল্লোলাকুল নিখিলের সনে।
সব ছেড়ে মৌনী হয়ে কোথা বসে রবে
আপনার অন্তরের অন্ধকার কোণে!
জেনো মনে, শিশু তুমি এ বিপুল ভবে,
অনন্ত কালের কোলে, গগনপ্রাঙ্গণে—
যত জান মনে কর কিছুই জান না।
বিনয়ে বিশ্বাসে প্রেমে হাতে লহো তুলি
বর্ণগন্ধগীতময় যে মহা-খেলনা
তোমারে দিয়াছে মাতা; হয় যদি ধূলি
হোক ধূলি, এ ধূলির কোথায় তুলনা!
থেকো না, অকালবৃদ্ধ, বসিয়া একেলা—
কেমনে মানুষ হবে না করিলে খেলা!

বন্ধন

বন্ধন ? বন্ধন বটে, সকলই বন্ধন—
স্নেহ প্রেম সুখতৃষ্ণা ; সে যে মাতৃপাণি
স্তন হতে স্তনান্তরে লইতেছে টানি
নব নব রসস্রোতে পূর্ণ করি মন
সদা করাইছে পান। স্তন্যের পিপাসা
কল্যাণদায়িনীরূপে থাকে শিশুমুখে—
তেমনি সহজ তৃষ্ণা আশা ভালোবাসা
সমস্ত বিশ্বের রস কত সুখে দুখে
করিতেছে আকর্ষণ, জনমে জনমে
প্রাণে মনে পূর্ণ করি গঠিতেছে ক্রমে
দুর্লভ জীবন ; পলে পলে নব আশ
নিয়ে যায় নব নব আস্বাদে আশ্রমে।
স্তন্যতৃষ্ণা নষ্ট করি মাতৃবন্ধপাশ
ছিন্ন করিবারে চাস কোন্ মুক্তিভ্রমে !

গতি

জানি আমি, সুখে দুঃখে হাসি ও ক্রন্দনে
পরিপূর্ণ এ জীবন, কঠোর বন্ধনে
ক্ষতচিহ্ন পড়ে যায় গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে।
জানি আমি, সংসারের সমুদ্র মন্থিতে
কারো ভাগ্যে সুধা ওঠে, কারো হলাহল
জানি না, কেন এ সব, কোন্ ফলাফল
আছে এই বিশ্বব্যাপী কর্মশৃঙ্খলার।
জানি না, কী হবে পরে, সবই অন্ধকার
আদি অন্ত এ সংসারে— নিখিল দুঃখের
অন্ত আছে কি না আছে, সুখবুভুক্ষের
মিটে কিনা চির-আশা। পণ্ডিতের দ্বারে
চাহি না এ জনমরহস্য জানিবারে।
চাহি না ছিঁড়িতে একা বিশ্বব্যাপী ডোর—
লক্ষকোটি প্রাণী-সাথে এক গতি মোর॥

মুক্তি

চক্ষু কর্ণ বুদ্ধি মন সব রুদ্ধ করি
বিমুখ হইয়া সর্ব জগতের পানে
শুদ্ধ আপনার ক্ষুদ্র আত্মাটিরে ধরি
মুক্তি-আশে সন্তরিব কোথায় কে জানে
পার্শ্ব দিয়ে ভেসে যাবে বিশ্বমহাতরী
অম্বর আকুল করি যাত্রীদের গানে,
শুভ্র কিরণের পালে দশ দিক ভরি',
বিচিত্র সৌন্দর্যে পূর্ণ অসংখ্য পরানে।
ধীরে ধীরে চলে যাবে দূর হতে দূরে
অখিল ক্রন্দন-হাসি আঁধার-আলোক,
বহে যাবে শূন্যপথে সকরুণ সুরে
অনন্ত-জগৎ-ভরা যত দুঃখশোক।
বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে,
আমি একা বসে রব মুক্তিসমাধিতে ?।

অক্ষমা

যেখানে এসেছি আমি, আমি সেথাকার,
দরিদ্রসন্তান আমি দীন ধরণীর।
জন্মাবধি যা পেয়েছি সুখদুঃখভার
বহু ভাগ্য বলে তাই করিয়াছি স্থির।
অসীম ঐশ্বর্যরাশি নাই তোর হাতে,
হে শ্যামলা সর্বসহা জননী মৃন্ময়ী!
সকলের মুখে অন্ন চাহিস জোগাতে,
পারিস নে কত বার— 'কই অন্ন কই'
কাঁদে তোর সন্তানেরা ম্লানশুষ্কমুখ।
জানি, মা গো, তোর হাতে অসম্পূর্ণ সুখ—
যা-কিছু গড়িয়া দিস ভেঙে ভেঙে যায়,
সব তাতে হাত দেয় মৃত্যু সর্বভুক্,
সব আশা মিটাইতে পারিস নে হায়—
তা বলে কি ছেড়ে যাব তোর তপ্ত বুক!

দরিদ্রা

দরিদ্রা বলিয়া তোরে বেশি ভালোবাসি,
হে ধরিত্রী, স্নেহ তোর বেশি ভালো লাগে—
বেদনাকাতর মুখে সকরুণ হাসি
দেখে মোর মর্ম-মাঝে বড়ো ব্যথা জাগে।
আপনার বক্ষ হতে রসরক্ত নিয়ে
প্রাণটুকু দিয়েছিস সন্তানের দেহে,
অহর্নিশি মুখে তার আছিস তাকিয়ে,
অমৃত নারিস দিতে প্রাণপণ স্নেহে।
কত যুগ হতে তুই বর্ণগন্ধগীতে
সৃজন করিতেছিস আনন্দ-আবাস,
আজও শেষ নাহি হল দিবসে নিশীথে—
স্বর্গ নাই, রচেছিস স্বর্গের আভাস।
তাই তোর মুখখানি বিষাদকোমল,
সকল সৌন্দর্যে তোর ভরা অশ্রুজল ॥

আত্মসমর্পণ

তোমার আনন্দগানে আমি দিব সুর
যাহা জানি দুয়েকটি প্রীতিসুমধুর
অন্তরের ছন্দোগাথা ; দুঃখের ক্রন্দনে
বাজিবে আমার কণ্ঠ বিষাদবিধুর
তোমার কণ্ঠের সনে ; কুসুমে চন্দনে
তোমারে পূজিব আমি ; পরাব সিন্দূর
তোমার সীমন্তে ভালে ; বিচিত্র বন্ধনে
তোমারে বাঁধিব আমি ; প্রমোদসিন্ধুর
তরঙ্গেতে দিব দোলা নব ছন্দে তানে।
মানব-আত্মার গর্ব আর নাহি মোর,
চেয়ে তোর স্নিগ্ধশ্যাম মাতৃমুখপানে
ভালোবাসিয়াছি আমি ধূলিমাটি তোর।
জন্মেছি যে মর্তকোলে ঘৃণা করি তারে
ছুটিব না স্বর্গ আর মুক্তি খুঁজিবারে॥

৫ অগ্রহায়ণ ১৩০০

অচল স্মৃতি

আমার হৃদয়ভূমি-মাঝখানে
জাগিয়া রয়েছে নিতি
অচল ধবল শৈল -সমান
একটি অচল স্মৃতি।
প্রতিদিন ঘিরি ঘিরি
সে নীরব হিমগিরি
আমার দিবস আমার রজনী
আসিছে যেতেছে ফিরি॥

যেখানে চরণ রেখেছে সে মোর
মর্ম গভীরতম—
উন্নত শির রয়েছে তুলিয়া
সকল উচ্চে মম।
মোর কল্পনা শত
রঙিন মেঘের মতো
তাহারে ঘেরিয়া হাসিছে কাঁদিছে,
সোহাগে হতেছে নত॥

আমার শ্যামল তরুলতাগুলি
ফুলপল্লবভারে

সরস কোমল বাহুবেষ্টনে
বাঁধিতে চাহিছে তারে।
শিখর গগনলীন
দুর্গম জনহীন,
বাসনাবিহগ একেলা সেথায়
ধাইছে রাত্রিদিন॥

চারি দিকে তার কত আসা-যাওয়া,
কত গীত, কত কথা—
মাঝখানে শুধু ধ্যানের মতন
নিশ্চল নীরবতা।
দূরে গেলে তবু, একা
সে শিখর যায় দেখা—
চিত্তগগনে আঁকা থাকে তার
নিত্যনীহাররেখা॥

উড্‌ফীল্‌ড্‌। সিমলা
১১ অগ্রহায়ণ ১৩০০

কণ্টকের কথা

একদা পুলকে প্রভাত-আলোকে
গাহিছে পাখি,
কহে কণ্টক বাঁকা কটাক্ষে
কুসুমে ডাকি—
'তুমি তো কোমল বিলাসী কমল,
দুলায় বায়ু,
দিনের কিরণ ফুরাতে ফুরাতে
ফুরায় আয়ু!
এ পাশে মধুপ মধুমদে ভোর,
ও পাশে পবন পরিমলচোর—
বনের দুলাল, হাসি পায় তোর
আদর দেখে।
আহা মরি মরি, কী রঙিন বেশ,
সোহাগহাসির নাহি আর শেষ,
সারা বেলা ধরি রসালসাবেশ
গন্ধ মেখে।
হায় ক'দিনের আদর সোহাগ,
সাধের খেলা—
ললিত মাধুরী, রঙিন বিলাস,
মধুপমেলা॥

'ওগো, নহি আমি তোদের মতন
সুখের প্রাণী—
হাব ভাব হাস, নানারঙা বাস
নাহিকো জানি।
রয়েছি নগ্ন, জগতে লগ্ন
আপন বলে—
কে পারে তাড়াতে, আমারে মাড়াতে
ধরণীতলে?
তোদের মতন নহি নিমেষের,
আমি এ নিখিলে চিরদিবসের—
বৃষ্টি-বাদল ঝড়-বাতাসের
না রাখি ভয়।
সতত একাকী, সঙ্গীবিহীন—
কারো কাছে কোনো নাহি প্রেম-ঋণ,
চাটুগান শুনি সারা নিশিদিন
করি না ক্ষয়।
আসিবে তো শীত, বিহঙ্গগীত
যাইবে থামি,
ফুলপল্লব ঝরে যাবে সব—
রহিব আমি॥

'চেয়ে দেখো মোরে, কোনো বাহুল্য
কোথাও নাই—

স্পষ্ট সকলই— আমার মূল্য
জানে সবাই।
এ ভীরু জগতে যার কাঠিন্য
জগৎ তারি।
নখের আঁচড়ে আপন চিহ্ন
রাখিতে পারি।
কেহ জগতেরে চামর ঢুলায়,
চরণে কোমল হস্ত বুলায়,
নতমস্তকে লুটায়ে ধুলায়
প্রণাম করে—
ভুলাইতে মন কত করে ছল—
কাহারো বর্ণ, কারো পরিমল,
বিফল বাসরসজ্জা, কেবল
দু দিন -তরে।
কিছুই করি না, নীরবে দাঁড়ায়ে
তুলিয়া শির
বিঁধিয়া রয়েছি অন্তরমাঝে
এ পৃথিবীর ॥

'আমারে তোমরা চাহ না চাহিতে
চোখের কোণে,
গরবে ফাটিয়া উঠেছ ফুটিয়া
আপন-মনে।

আছে তব মধু, থাক্‌ সে তোমার—
আমার নাহি।
আছে তব রূপ— মোর পানে কেহ
দেখে না চাহি।
কারো আছে শাখা, কারো আছে দল,
কারো আছে ফুল, কারো আছে ফল—
আমারি হস্ত রিক্ত কেবল
দিবসযামী।
ওহে তরু, তুমি বৃহৎ প্রবীণ,
আমাদের প্রতি অতি উদাসীন—
আমি বড়ো নহি, আমি ছায়াহীন,
ক্ষুদ্র আমি।
হই না ক্ষুদ্র, তবুও রুদ্র
ভীষণ ভয়—
আমার দৈন্য সে মোর সৈন্য,
তাহারি জয়।'

২৯ কার্তিক ১৩০

নিরুদ্দেশ যাত্রা

আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরী ?
বলো কোন্ পার ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী।
যখনি শুধাই, ওগো বিদেশিনী,
তুমি হাস শুধু মধুরহাসিনী—
বুঝিতে না পারি কী জানি কী আছে
তোমার মনে।
নীরবে দেখাও অঙ্গুলি তুলি
অকূল সিন্ধু উঠিছে আকুলি,
দূরে পশ্চিমে ডুবিছে তপন
গগনকোণে।

কী আছে হোথায়— চলেছি কিসের
অন্বেষণে ?।

বলো দেখি মোরে, শুধাই তোমায়
অপরিচিতা—
ওই যেথা জ্বলে সন্ধ্যার কূলে
দিনের চিতা,
ঝলিতেছে জল তরল অনল,
গলিয়া পড়িছে অম্বরতল,
দিক্‌বধূ যেন ছলছল-আঁখি
অশ্রুজলে,
হোথায় কি আছে আলয় তোমার
ঊর্মিমুখর সাগরের পার
মেঘচুম্বিত অস্তগিরির
চরণতলে ?
তুমি হাস শুধু মুখপানে চেয়ে
কথা না ব'লে ॥

হূহূ ক'রে বায়ু ফেলিছে সতত
দীর্ঘশ্বাস।
অন্ধ আবেগে করে গর্জন
জলোচ্ছ্বাস।

সংশয়ময় ঘননীলনীর,
কোনো দিকে চেয়ে নাহি হেরি তীর,
অসীম রোদন জগৎ প্লাবিয়া
দুলিছে যেন।
তারি 'পরে ভাসে তরণী হিরণ,
তারি 'পরে পড়ে সন্ধ্যাকিরণ,
তারি মাঝে বসি এ নীরব হাসি
হাসিছ কেন?
আমি তো বুঝি না কী লাগি তোমার
বিলাস হেন॥

যখন প্রথম ডেকেছিলে তুমি
'কে যাবে সাথে',
চাহিনু বারেক তোমার নয়নে
নবীন প্রাতে।
দেখালে সমুখে প্রসারিয়া কর
পশ্চিমপানে অসীম সাগর,
চঞ্চল আলো আশার মতন
কাঁপিছে জলে।
তরীতে উঠিয়া শুধানু তখন
আছে কি হোথায় নবীন জীবন,
আশার স্বপন ফলে কি হোথায়
সোনার ফলে?

মুখপানে চেয়ে হাসিলে কেবল
কথা না ব'লে ॥

তার পরে কভু উঠিয়াছে মেঘ,
কখনো রবি—
কখনো ক্ষুব্ধ সাগর কখনো
শান্ত ছবি।
বেলা বহে যায়, পালে লাগে বায়,
সোনার তরণী কোথা চলে যায়—
পশ্চিমে হেরি নামিছে তপন
অস্তাচলে।
এখন বারেক শুধাই তোমায়
স্নিগ্ধ মরণ আছে কি হোথায়—
আছে কি শান্তি, আছে কি সুপ্তি
তিমিরতলে ?
হাসিতেছ তুমি তুলিয়া নয়ন
কথা না ব'লে ॥

আঁধার রজনী আসিবে এখনি
মেলিয়া পাখা,
সন্ধ্যা-আকাশে স্বর্ণ-আলোক
পড়িবে ঢাকা।

শুধু ভাসে তব দেহসৌরভ,
শুধু কানে আসে জলকলরব,
গায়ে উড়ে পড়ে বায়ুভরে তব
কেশের রাশি।
বিকলহৃদয় বিবশশরীর
ডাকিয়া তোমারে কহিব অধীর,
'কোথা আছ, ওগো, করহ পরশ
নিকটে আসি।'
কহিবে না কথা, দেখিতে পাব না
নীরব হাসি॥

২৭ অগ্রহায়ণ ১৩০০

—

পরবর্তী রচনাপ্রসঙ্গে ছিন্নপত্র গ্রন্থ হইতে যে-সকল উদ্‌ধৃতি দেওয়া হইয়াছে, সেগুলি প্রায় একই ভাষায়, একই তারিখে, অধুনাপ্রচলিত ছিন্নপত্রাবলী গ্রন্থেও মুদ্রিত।

বর্তমান গ্রন্থের পূর্বমুদ্রণে (আশ্বিন ১৩৭০) কতকগুলি মুদ্রণ-প্রমাদ হয়, গ্রন্থের পৃষ্ঠা ও কবিতার ছত্র নির্দেশ -পূর্বক তাহার সংশোধন নিম্নে দেওয়া গেল—

৬৭। ১৬ : জ্বলেছে

৮১। ১৬ : উঠিত

৮৩। ১ : সুগম্ভীর

১২২। শেষ : ফুটে ফুটে টুটে

বর্তমান মুদ্রণে 'হিং টিং ছট্' কবিতার প্রথম স্তবকের পঞ্চদশ ছত্রে 'ছট্‌ফট্' স্থলে ছাপা হইয়াছে (পৃ ৪৪) : ঝট্‌পট্। এই পাঠ পাণ্ডু-লিপি, ১২৯৯ শ্রাবণের 'সাধনা', প্রথম-প্রকাশিত 'সোনার তরী' (১৩০০), 'কাব্যগ্রন্থাবলী' (১৩০৩) ও 'কাব্যগ্রন্থ' (১৩১০)—সর্বত্র দেখা যায়। 'ছট্‌ফট্' পরবর্তী মুদ্রণপ্রমাদ মনে হয়।

বর্তমান মুদ্রণে 'গানভঙ্গ' কবিতার রচনাকাল নির্দেশ (পৃ ৭০) করা হইয়াছে : ২৪ আষাঢ় ১২৯৯। পূর্বপ্রচলিত '২৪ আষাঢ় ১৩০০' ভুল ছিল, তাহা সাধনা পত্রে কবিতাটির প্রকাশকাল হইতেও জানা যায়।

১৩৭৬

বর্তমান মুদ্রণে পৃ ৮২। ছ ৭ মুদ্রণপ্রমাদ 'আকারপ্রকারবিহীন' সংশোধিত হইয়াছে : 'আকারপ্রকারহীন'। অনাদৃত কবিতার চতুর্থ স্তবকের তৃতীয় ছত্রে 'ক্ষুধাতৃষ্ণা' পাঠ অশুদ্ধ। রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি অনুসারে শুদ্ধপাঠ হইবে : ক্ষুধাতৃষা।

১৩৮৪

এই গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'সোনার তরী'র তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া বীরেশ্বর গোস্বামীকে একটি পত্রে (৯ অগ্রহায়ণ ১৩১৩) রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন :

সংসার আমাদের জীবনের সমস্ত কাজ গ্রহণ করে, কিন্তু আমাদিগকে তো গ্রহণ করে না। আমার চিরজীবনের ফসল যখন সংসারের নৌকায় বোঝাই করিয়া দিই তখন মনে এ আশা থাকে যে, আমারও ওইসঙ্গে স্থান হইবে, কিন্তু সংসার আমাদিগকেই দুই দিনেই ভুলিয়া যায়। একবার ভাবিয়া দেখো, কত লক্ষ কোটি বিস্মৃত মানবের জীবনপাতের উপর আমাদের প্রত্যেকের জীবন গঠিত। আমাদের আহারবিহার, বসনভূষণ, ধর্মকর্ম, ভাষাভাব, সমস্তই পূর্ববর্তী অসংখ্য মানবের বিস্মৃত কর্ম বিস্মৃত চেষ্টার দ্বারাই বিধৃত। আমরা আগুন জ্বালাইয়া রাঁধি, যাহারা আগুন আবিষ্কার করিয়াছিল তাহাদিগকে কে জানে? যাহারা চাষ আরম্ভ করিয়াছিল তাহাদের নামই বা কোথায়? যাহারা যুগে যুগে নানা রূপে মানুষকেই গড়িয়া তুলিতেছে তাহাদের কাজ আমাদের মধ্যে অমর হইয়া আছে, কিন্তু তাহারা নামধাম সুখদুঃখ লইয়া কোন্ বিস্মৃতির মধ্যে অন্তর্হিত হইয়াছে। অথচ প্রত্যেকেই সংসারকে বলিয়াছিল, 'আমার সমস্ত লও, তোমার জন্যই আমি খাটিতেছি, তোমাকে দিয়াই আমার সুখ। আমার সমস্তই লও। কিন্তু আমাকেও ঠেলিয়ো না, আমাকে ভুলিয়ো না— আমার কাজের মধ্যে আমার চিহ্নটুকু যত্ন করিয়া রাখিয়া দিয়ো।' কিন্তু, এত স্থান কোথায়? আমাদের জীবনের ফসল কোনো না কোনো আকারে থাকিয়া যায়, কিন্তু আমরা থাকি না।

মানুষের এই একটি ব্যাকুলতা, এই বেদনা চিরদিন চলিয়া আসিতেছে। ব্যক্তিগত জীবনে আমাদের ভালোবাসার মধ্যেও এই ব্যথা আছে;

আমাদের সেবা, আমাদের প্রেম আমরা দিতে পারি, সেইসঙ্গে নিজেকে দিতে গেলেই সেটা বোঝা হইয়া পড়ে। আমরা প্রীতি দান করিব, কর্ম দান করিব, কিন্তু সেইসঙ্গে আমাকেও চালাইতে যাইব না, ইহাই জীবনের শিক্ষা; কারণ আমাকে চালাইতে গেলেই সেটা নিতান্ত অনাবশ্যক হয়, তাহাতে স্থান কুলায় না, সুতরাং যাহা দিলাম তাহার মূল্য কমিয়া যায়।

'এ পারেতে ছোটো খেত, আমি একেলা'— একলা নয় তো কী? আমরা প্রত্যেকেই যে একলা— আমাদের প্রত্যেকের চারি দিকে যে অতলস্পর্শ স্বাতন্ত্র্যের ব্যবধান আছে তাহা কে অতিক্রম করিবে? এই ব্যবধানের মধ্যে, প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্যের অন্তরালে, আপনার জীবনের ক্ষেত্রটুকু লইয়া কাজ করিয়া যাইতেছি— কাজ করিতে করিতে, ফসল জমা হইতে হইতে, এমন দিন আসিয়া পড়ে যখন বুঝিতে পারি, এ ফসল আমি কোথাও সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিব না। এ-সমস্তই আমাকে দিয়া যাইতে হইবে। কাহাকে দিয়া যাইব? তাহাকে চিনি এবং চিনি না, সে আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে কিন্তু ধরা দেয় নাই। আমি তাহাকে বলি, 'ওগো, তুমি আমার সব লও, এবং আমাকেও লও।' সে আমার সব লয়, কিন্তু আমাকে লয় না। আমাদের সকলের কুড়াইয়া লইয়া সে কোথায় চলিয়াছে তাহা কি আমরা জানি? সে যে অনির্দিষ্টের দিকে অহরহ যাইতেছে তাহার কূল কি আমরা দেখিয়াছি? কিন্তু, তবু এই নিরুদ্দেশ যাত্রার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এই অপরিচিত অথচ পরিচিত মানবসংসারকেই, আমাদের যাহা-কিছু সমস্ত দিয়া যাইতে হইবে; নিজে তো কিছুই লইয়া যাইতে পারিব না, নিজেকেও দিয়া যাইতে পারিব না।

কিন্তু, এ-সমস্ত ব্যাখ্যাকে ধিক্। কবিতার রস এই ব্যাখ্যার উপরেই যদি নির্ভর করে তবে ইহা বৃথাই লিখিত হইয়াছিল। মনে করো-না কোনোই বিশেষ অর্থ নাই; কেবল বর্ষা, নদীর চর, কেবল মেঘলা দিনের

ভাব, একটা ছবি, একটা সংগীতমাত্রই যদি হয় তাহাতে ক্ষতি কী?

'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের 'তরী বোঝাই' শীর্ষক ভাষণে (৪ চৈত্র ১৩১৫) রবীন্দ্রনাথ 'সোনার তরী'র ব্যাখ্যা করিয়াছেন :

'সোনার তরী' বলে একটা কবিতা লিখেছিলুম, এই উপলক্ষে তার একটা মানে বলা যেতে পারে।

মানুষ সমস্ত জীবন ধরে ফসল চাষ করছে। তার জীবনের খেতটুকু দ্বীপের মতো, চারি দিকেই অব্যক্তের দ্বারা সে বেষ্টিত, ওই একটুখানি তার কাছে ব্যক্ত হয়ে আছে— সেইজন্য গীতা বলেছেন—

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা[১] ॥

যখন কাল ঘনিয়ে আসছে, যখন চারি দিকের জল বেড়ে উঠছে, যখন আবার অব্যক্তের মধ্যে তার ওই চরটুকু তলিয়ে যাবার সময় হল, তখন তার সমস্ত জীবনের কর্মের যা-কিছু নিত্য ফল তা সে ওই সংসারের তরণীতে বোঝাই করে দিতে পারে। সংসার সমস্তই নেবে, একটি কণাও ফেলে দেবে না। কিন্তু যখন মানুষ বলে 'ওই সঙ্গে আমাকেও নাও', 'আমাকেও রাখো', তখন সংসার বলে, 'তোমার জন্যে জায়গা কোথায়? তোমাকে নিয়ে আমার হবে কী? তোমার জীবনের ফসল যা-কিছু রাখবার তা সমস্তই রাখব, কিন্তু তুমি তো রাখবার যোগ্য নও।'

প্রত্যেক মানুষ জীবনের কর্মের দ্বারা সংসারকে কিছু না কিছু দান করছে, সংসার তার সমস্তই গ্রহণ করছে, রক্ষা করছে, কিছুই নষ্ট হতে দিচ্ছে না— কিন্তু, মানুষ যখন সেইসঙ্গে অহংকেই চিরন্তন করে রাখতে চাচ্ছে, তখন তার চেষ্টা বৃথা হচ্ছে। এই-যে জীবনটি ভোগ করা গেল

১ রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-ধৃত পাঠ। প্রচলিত পাঠ : পরিদেবনা

অহংটিকেই তার খাজনাস্বরূপ মৃত্যুর হাতে দিয়ে হিসাব চুকিয়ে যেতে হবে— ওটি কোনোমতেই জমাবার জিনিস নয়।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিত একটি পত্রে (১৩৩৯) রবীন্দ্রনাথ 'সোনার তরী' কবিতার প্রসঙ্গে বলিতেছেন :

এক জাতের কবিতা আছে যা লেখা হয় বাইরের দরজা বন্ধ ক'রে। সেগুলো হয়তো অতীতের স্মৃতি বা অনাগতের প্রত্যাশা, বাসনার অতৃপ্তি বা আকাঙ্ক্ষার আবেগ, কিম্বা রূপরচনার আগ্রহের উপর প্রতিষ্ঠিত। আবার এক জাতের কবিতা আছে যা মুক্তদ্বার অন্তরের সামগ্রী, বাইরের সমস্তকিছুকে আপনার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে।··· যেমন 'সোনার তরী' কবিতাটি। ছিলাম তখন পদ্মার বোটে। জলভারনত কালো মেঘ আকাশে, ও পারে ছায়াঘন তরুশ্রেণীর মধ্যে গ্রামগুলি, বর্ষার পরিপূর্ণ পদ্মা খরবেগে বয়ে চলেছে, মাঝে মাঝে পাক খেয়ে ছুটেছে ফেনা। নদী অকালে কূল ছাপিয়ে চরের ধান দিনে দিনে ডুবিয়ে দিচ্ছে। কাঁচা-ধানে-বোঝাই চাষীদের ডিঙিনৌকা হুহু করে স্রোতের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে। ওই অঞ্চলে এই চরের ধানকে বলে জলি ধান।··· ভরা পদ্মার উপরকার ওই বাদল-দিনের ছবি 'সোনার তরী' কবিতার অন্তরে প্রচ্ছন্ন এবং তার ছন্দে প্রকাশিত।

'সোনার তরী' কবিতার কল্পনা শ্রাবণে ও রচনা ফাল্গুনে, এ সম্বন্ধে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

তুমি পঞ্জিকা মিলিয়ে যদি কবিতার তাৎপর্য নির্ণয় করতে চাও তো বিপন্ন হবে। বুধবারের পর বৃহস্পতিবার আসে অত্যন্ত সাধারণ নিয়মে। সেটাকে অবজ্ঞা কোরো। আমাদের জীবনে, সুতরাং সাহিত্যেও, হয়তো

কোনো-একটা বিশেষ বুধ বা বৃহস্পতি বার সপ্তাহ ডিঙিয়ে চব্বিশ ঘণ্টাকে উপেক্ষা করেই আসন রক্ষা করে। যে দিন বর্ষার অপরাহ্ণে খরস্রোত পদ্মার উপর দিয়ে কাঁচা ধানে ডিঙিনৌকা বোঝাই করে মগ্নপ্রায় চর থেকে চাষীরা এ পারে চলে আসছে, সে দিনটা সন তারিখ মাস পার হয়ে আজও আমার মনে আছে। সেই দিনেই 'সোনার তরী' কাব্যের সঞ্চার হয়েছিল মনে, তার প্রকাশ হয়েছিল কবে তা আমার মনেও নেই। এইরকম অবস্থায় ইতিহাসের ভুল হবারই কথা। কারণ, আমার মনে 'সোনার তরী'র যে ইতিহাসটা সত্য হয়ে আছে সেটা হচ্ছে সেই শ্রাবণ-দিনের ইতিহাস, সেটা কোন্ তারিখে লিখিত হয়েছিল সেইটেই আকস্মিক— সে দিনটা বিশেষ দিন নয়, সে দিনটা আমার স্মৃতিপটে কোনো চিহ্ন দিয়েই যায় নি। অতএব, আমার ইতিহাসে আর তোমাদের ইতিহাসে এইখানে বাদপ্রতিবাদ হবেই; দুর্ভাগ্যক্রমে তোমাদের হাতে দলিল আছে, আমার হাতে নেই। আদালতে তোমাদেরই জিত রইল। আমার দলিলের তারিখ কবিতার অভ্যন্তরেই আছে— 'শ্রাবণগগন ঘিরে ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে'। তুমি বলবে ওটা কাল্পনিক; আমি বলব তোমাদের তারিখটা রিয়ালিস্টিক।

শ্রীমতী নলিনী দেবীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রে (২৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৪) 'বিম্ববতী' কবিতা -রচনার ইতিহাস জানা যায়:

অভি বলে আমার একটি ভাইঝি ছিল, তার গলা ছিল খুব মিষ্টি। একদিন কী একটা কারণে আমার খুব রাগ হয়েছিল, অভি এসে আমার চৌকির পিছনে দাঁড়িয়ে চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ঠিক সেই সময়ে যা-তা বকে গেল, এক মুহূর্তে আমার সমস্ত রাগ জুড়িয়ে গেল। সে আজ অনেক দিনের কথা, কিন্তু আজও মনে আছে। তারই মুখে রূপকথা শুনে

আমি 'সোনার তরী'তে বিম্ববতীর গল্প লিখেছিলেম।

রবীন্দ্রনাথ 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থে (সাহাজাদপুরের পথে, ৬ জুলাই ১৮৯৪) 'শৈশবসন্ধ্যা' কবিতাটির ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন :

সন্ধ্যাবেলায় পাবনা শহরের একটি খেয়াঘাটের কাছে বোট বাঁধা গেল। ও পার থেকে জনকতক লোক বাঁয়া-তবলার সঙ্গে গান গাচ্ছে, একটা মিশ্রিত কলরব কানে এসে প্রবেশ করছে; রাস্তা দিয়ে স্ত্রী পুরুষ যারা চলেছে তাদের ব্যস্তভাব; গাছপালার ভিতর দিয়ে দীপালোকিত কোঠাবাড়ি দেখা যাচ্ছে; খেয়াঘাটে নানাশ্রেণী লোকের ভিড়। আকাশে নিবিড় একটা একরঙা মেঘ, সন্ধ্যাও অন্ধকার হয়ে এসেছে; ও পারে সার-বাঁধা মহাজনি নৌকোয় আলো জ্বলে উঠল; পূজাঘর থেকে সন্ধ্যারতির কাঁসর ঘণ্টা বাজতে লাগল— বাতি নিবিয়ে দিয়ে বোটের জানলায় বসে আমার মনে ভারী একটা অপূর্ব আবেগ উপস্থিত হল। অন্ধকারের আবরণের মধ্যে দিয়ে এই লোকালয়ের একটি যেন সজীব হৃৎস্পন্দন আমার বক্ষের উপর এসে আঘাত করতে লাগল। এই মেঘলা আকাশের নীচে, নিবিড় সন্ধ্যার মধ্যে, কত লোক, কত ইচ্ছা, কত কাজ, কত গৃহ, গৃহের মধ্যে জীবনের কত রহস্য— মানুষে মানুষে কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি কত শতসহস্র প্রকারের ঘাতপ্রতিঘাত। বৃহৎ জনতার সমস্ত ভালোমন্দ, সমস্ত সুখদুঃখ এক হয়ে তরুলতাবেষ্টিত ক্ষুদ্র বর্ষানদীর দুই তীর থেকে একটি সকরুণ সুন্দর সুগম্ভীর রাগিণীর মতো আমার হৃদয়ে এসে প্রবেশ করতে লাগল।

আমার 'শৈশবসন্ধ্যা' কবিতায় বোধ হয় কতকটা এই ভাব প্রকাশ করতে চেয়েছিলুম। কথাটা সংক্ষেপে এই যে, মানুষ ক্ষুদ্র এবং ক্ষণস্থায়ী অথচ ভালোমন্দ এবং সুখদুঃখ-পরিপূর্ণ জীবনের প্রবাহ সেই পুরাতন

সুগভীর কলস্বরে চিরদিন চলছে ও চলবে— নগরের প্রান্তে সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই চিরন্তন কলধ্বনি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে; মানুষের দৈনিক জীবনের ক্ষণিকতা ও স্বাতন্ত্র্য এই অবিচ্ছিন্ন সুরের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে; সবসুদ্ধ খুব একটা বিস্তৃত আদি-অন্ত-শূন্য প্রশ্নোত্তরহীন মহাসমুদ্রের এক-তান শব্দের মতো অন্তরের নিস্তব্ধতার মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করছে। এক-এক সময়ে কোথাকার কোন্‌ ছিদ্র দিয়ে জগতের বড়ো বড়ো প্রবাহ হৃদয়ের মধ্যে পথ পায়— তার যে একটা ধ্বনি শোনা যায় সেটাকে কথায় তর্জমা করা অসাধ্য।

'হিং টিং ছট্‌' কবিতাটি চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে আক্রমণ করিয়া লিখিত— রচনার প্রকাশ-কালে অনেকে এইরূপ ধারণা পোষণ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা'তে এই অনুমানের প্রতিবাদ করিয়া লেখেন :

কোনো সরল অথবা অসরল বুদ্ধিতে যে এরূপ অমূলক সন্দেহ উদিত হইতে পারে, তাহা আমার কল্পনার অগোচর ছিল।

'দুই পাখি' কবিতার প্রসঙ্গে 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের নিম্ন-সংকলিত অংশ প্রণিধেয় :

বাড়ির বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল; এমন-কি বাড়ির ভিতরেও আমরা সর্বত্র যেমন-খুশি যাওয়া-আসা করিতে পারিতাম না। সেইজন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্তপ্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ শব্দ গন্ধ দ্বার-জানলার নানা ফাঁক-ফুকর দিয়া, এ দিক ও দিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইশারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত,

আমি ছিলাম বদ্ধ; মিলনের উপায় ছিল না, সেইজন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল। আজ [ভৃত্য শ্যামের অঙ্কিত] সেই খড়ির গণ্ডি মুছিয়া গেছে, কিন্তু গণ্ডি তবু ঘোচে নাই। দূর এখনো দূরে, বাহির এখনো বাহিরেই। বড়ো হইয়া যে কবিতাটা লিখিয়াছিলাম তাহাই মনে পড়ে—

খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে,
বনের পাখি ছিল বনে।

'গানভঙ্গ' কবিতাটির কাহিনী স্বপ্নলব্ধ বলা চলে। 'ছিন্নপত্র' অথবা 'ছিন্নপত্রাবলী' গ্রন্থে ৩ জুলাই ১৮৯২ তারিখের পত্র দ্রষ্টব্য।

'প্রতীক্ষা'-রচনার বিশদ স্থানকাল একটি পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়— তৃতীয় স্তবকের পর '১৬ অগ্রহায়ণ | রামপুর বোয়ালিয়া', সপ্তম স্তবকের পর '২০ অগ্রহায়ণ | নাটোর। | রোগশয্যা', এবং সর্বশেষে 'শিলাইদহ বোট। | ২৭ অগ্রহায়ণ।' অর্থাৎ, কবিতাটি এক স্থলে এক কালে লেখা হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথের অন্যতম পাণ্ডুলিপি ও 'ছিন্নপত্রাবলী' -ধৃত একখানি পত্র (সংখ্যা ৮১) তুলনায় আলোচনার ফলে সম্প্রতি জানা গিয়াছে, পুরীতে বলেন্দ্রনাথ-সহ কবি সমুদ্র দর্শন করেন ২ ফাল্গুন ১২৯৯ তারিখের সন্ধ্যায়। 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতার পূর্বাভাস মাত্র লেখা হয় কয়েক ছত্রে 'উড়িয়া' জাহাজে, কলিকাতার উদ্দেশে কটক ছাড়ার পরে।[২] কবিতা-রচনা রামপুর বোয়ালিয়ায় বন্ধুবর লোকেন পালিতের কর্মস্থলে ঐ সমুদ্র-দর্শনের প্রায় দেড় মাস পরে।

'সমুদ্রের প্রতি' এবং 'বসুন্ধরা' উভয় কবিতাতেই বৃহৎ ধরণীর প্রতি

২ দ্রষ্টব্য : কানাই সামন্ত, রবীন্দ্রপ্রতিভা (১৩৬৮), পৃ. ২৬৪, শেষ অনুচ্ছেদ।

কবির যে নাড়ীর টান অপূর্ব ছন্দোবন্ধে উদ্‌গীত, সে সম্পর্কে 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থে (শিলাইদহ, ২০ অগস্ট ১৮৯২) বলা হইয়াছে :

এ যেন এই বৃহৎ ধরণীর প্রতি একটা নাড়ীর টান। এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত, আমি কত দূর-দূরান্তর কত দেশ-দেশান্তরের জল স্থল পর্বত ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধ ভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম— তখন শরৎ-সূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে-একটি আনন্দরস, একটি জীবনী-শক্তি, অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ড ভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার এই-যে মনের ভাব এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্যসনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে-শিকড়ে শিরায়-শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থর্ থর্ করে কাঁপছে। এই পৃথিবীর উপর আমার যে একটি আন্তরিক আত্মীয়বৎসলতার ভাব আছে, ইচ্ছে করে সেটা ভালো ক'রে প্রকাশ করতে— কিন্তু, ওটা বোধ হয় অনেকেই ঠিকটি বুঝতে পারবে না, কী একটা কিম্ভূত রকমের মনে করবে।

'ছিন্নপত্র' গ্রন্থে ৮ মে ১৮৯৩ তারিখের পত্রে 'মানসসুন্দরী'-সম্পর্কে সকৌতুক এরূপ উল্লেখ দেখা যায় :

কবিতা আমার বহুকালের প্রেয়সী— বোধ হয় যখন আমার রথীর মতো বয়স ছিল তখন থেকে আমার সঙ্গে বাক্‌দত্তা হয়েছিল। তখন থেকে

আমাদের পুকুরের ধারে বটের তলা, বাড়ি-ভিতরের বাগান, বাড়ি-ভিতরের একতলার অনাবিষ্কৃত ঘরগুলো, এবং সমস্ত বাহিরের জগৎ, এবং দাসীদের মুখের সমস্ত রূপকথা এবং ছড়াগুলো, আমার মনের মধ্যে ভারী একটা মায়াজগৎ তৈরি করছিল। তখনকার সেই আবছায়া অপূর্ব মনের ভাব প্রকাশ করা ভারী শক্ত; কিন্তু এই পর্যন্ত বেশ বলতে পারি কবি-কল্পনার সঙ্গে তখন থেকেই মালাবদল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু, ও মেয়েটি পয়মন্ত নয় তা স্বীকার করতে হয়— আর যাই হোক, সৌভাগ্য নিয়ে আসেন না। সুখ দেন না বলতে পারি নে, কিন্তু স্বস্তির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। যাকে বরণ করেন তাকে নিবিড় আনন্দ দেন, কিন্তু এক-এক সময় কঠিন আলিঙ্গনে হৃৎপিণ্ডটি নিংড়ে রক্ত বের করে নেন। যে লোককে তিনি নির্বাচন করেন, সংসারের মাঝখানে ভিত্তি স্থাপন করে গৃহস্থ হয়ে স্থির হয়ে আয়েস করে বসা সে লক্ষ্মীছাড়ার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। কিন্তু, আমার আসল জীবনটি তার কাছেই বন্ধক আছে। 'সাধনা'ই লিখি আর জমিদারিই দেখি, যেমনি কবিতা লিখতে আরম্ভ করি অমনি আমার চিরকালের যথার্থ আপনার মধ্যে প্রবেশ করি— আমি বেশ বুঝতে পারি এই আমার স্থান। জীবনে জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে অনেক মিথ্যাচরণ করা যায়, কিন্তু কবিতায় কখনও মিথ্যা কথা বলি নে— সেই আমার জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের একমাত্র আশ্রয়স্থান।

'অনাদৃত' কবিতাটির ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থে ১৩ জুলাই ১৮৯৩ [৩০ আষাঢ় ১৩০০] তারিখের পত্রে লিখিয়াছেন :

মনে করো একজন ব্যক্তি তার জীবনের প্রভাতকালে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখছিল; সে সমুদ্রটা তার আপনার মন কিম্বা ঐ বাহিরের বিশ্ব কিম্বা উভয়ের-সীমানা-মধ্যবর্তী একটি ভাবের পারাবার,

সে কথা স্পষ্ট করে বলা হয় নি। যাই হোক, সেই অপূর্ব সৌন্দর্যময় অগাধ সমুদ্রের দিকে চেয়ে চেয়ে লোকটার মনে হল এই রহস্যপাথারের মধ্যে জাল ফেলে দেখা যাক-না কী পাওয়া যায়। এই ব'লে তো সে ঘুরিয়ে জাল ফেললে। নানা রকমের অপরূপ জিনিস উঠতে লাগল— কোনোটা বা হাসির মতো শুভ্র, কোনোটা বা অশ্রুর মতো উজ্জ্বল, কোনোটা বা লজ্জার মতো রাঙা। মনের উৎসাহে সে সমস্ত দিন ধ'রে ঐ কাজই কেবল করলে— গভীর তলদেশে যে-সকল সুন্দর রহস্য ছিল সেইগুলিকে তীরে এনে রাশীকৃত করে তুললে। এমনি করে জীবনের সমস্ত দিনটি যাপন করলে। সন্ধ্যার সময় মনে করলে এবারকার মতো যথেষ্ট হয়েছে, এখন এইগুলি নিয়ে তাকে দিয়ে আসা যাক্ গে। কাকে যে, সে কথাটা স্পষ্ট করে বলা হয় নি— হয়তো তার প্রেয়সীকে, হয়তো তার স্বদেশকে। কিন্তু, যাকে দেবে সে তো এ-সমস্ত অপূর্ব জিনিস কখনো দেখে নি। সে ভাবলে এগুলো কী, এর আবশ্যকতাই বা কী, এতে কী অভাব দূর হবে, দোকানদারের কাছে যাচিয়ে দেখলে এর কতই বা মূল্য হতে পারে! এক কথায়, এ বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস ভূগোল অর্থনীতি সমাজনীতি ধর্মনীতি তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি কিছুই নয়— এ কেবল কতকগুলো রঙিন ভাব মাত্র, তারও যে কোন্‌টার কী নাম কী বিবরণ তারও ভালো পরিচয় পাওয়া যায় না। ফলতঃ, সমস্ত-দিনের-জাল-ফেলা অগাধ সমুদ্রের এই রত্নগুলি যাকে দেওয়া গেল সে বললে, 'এ আবার কী!' জেলেরও মনে তখন অনুতাপ হল, 'সত্যি বটে, এ তো বিশেষ কিছু নয়, আমি কেবল জাল ফেলেছি আর তুলেছি; আমি তো হাটেও যাই নি, পয়সাকড়িও খরচ করি নি, এর জন্যে তো আমাকে কাউকে এক পয়সা খাজনা কিম্বা মাশুল দিতে হয় নি।' সে তখন কিঞ্চিৎ বিষণ্নমুখে লজ্জিতভাবে সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে ঘরের দ্বারে বসে বসে একে একে রাস্তায় ফেলে দিলে।

তার পরদিন সকাল বেলায় পথিকরা এসে সেই বহুমূল্য জিনিসগুলি দেশে বিদেশে আপন আপন ঘরে নিয়ে গেল। বোধ হচ্ছে এই কবিতাটি যিনি লিখেছেন, তিনি মনে করছেন তাঁর গৃহকার্যনিরতা অন্তঃপুরবাসিনী জন্মভূমি, তাঁর সমসাময়িক পাঠকমণ্ডলী, তাঁর কবিতাগুলির ঠিক ভাব-গ্রহ করতে পারবে না, তার যে কতখানি মূল্য সে তাদের জ্ঞানগোচর নয়, অতএব, এখনকার মতো এ-সমস্ত পথেই ফেলে দেওয়া যাচ্ছে—'তোমরাও অবহেলা করো, আমিও অবহেলা করি, কিন্তু এ রাত্রি যখন পোহাবে তখন পস্টারিটি এসে এগুলি কুড়িয়ে নিয়ে দেশে বিদেশে চলে যাবে।' কিন্তু, তাতে ঐ জেলে লোকটার মনের আক্ষেপ কি মিটবে? যাই হোক, 'পস্টারিটি' যে অভিসারিণী রমণীর মতো দীর্ঘ রাত্রি ধ'রে ধীরে ধীরে কবির দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং হয়তো নিশিশেষে এসে উপস্থিত হতেও পারে, এ সুখকল্পনাটুকু কবিকে ভোগ করতে দিতে কারও বোধ হয় আপত্তি না হতেও পারে।

'দেউল' কবিতাটির সম্পর্কে কবি পূর্বোদ্ধৃতির পরেই বলেন :

সেই মন্দিরের কবিতাটির ঠিক অর্থটা কী ভালো মনে পড়ছে না। বোধ হয় সেটা সত্যিকার মন্দির সম্বন্ধে। অর্থাৎ, যখন কোণে বসে বসে কতকগুলো কৃত্রিম কল্পনার দ্বারা আপনার দেবতাকে আচ্ছন্ন ক'রে নিজের মনটাকেও একটা অস্বাভাবিক সুতীব্র অবস্থায় নিয়ে যাওয়া গেছে এমন সময় যদি হঠাৎ একটা সংশয়বজ্র প'ড়ে সেই-সমস্ত সুদীর্ঘ কালের কৃত্রিম প্রাচীর ভেঙে যায়, তখন হঠাৎ প্রকৃতির শোভা, সূর্যের আলোক এবং বিশ্বজনের কল্লোলগান এসে তন্ত্রমন্ত্র-ধূপধুনার স্থান অধিকার করে এবং তখন দেখতে পাই সেই যথার্থ আরাধনা এবং তাতেই দেবতার তুষ্টি।

সোনার তরীর প্রথম মুদ্রণাবধি 'বিশ্বনৃত্য' কবিতার রচনাকাল দেখা যায়: ২৬ ফাল্গুন ১২৯৯ [বুধবার]। পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়: শুক্রবার। তদনুযায়ী রচনাকাল হয়: ২৮ ফাল্গুন ১২৯৯।

'ঝুলন' কবিতাটি সম্পর্কে 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে 'সাহিত্যতত্ত্ব' (পঠিত ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪) প্রবন্ধে কবি মন্তব্য করিয়াছেন:

বদ্ধ জল যেমন বোবা, গুমট হাওয়া যেমন আত্মপরিচয়হীন, তেমনি প্রাত্যহিক আধ-মরা অভ্যাসের একটানা আবৃত্তি ঘা দেয় না চেতনায়, তাতে সত্তাবোধ নিস্তেজ হয়ে থাকে। তাই দুঃখে বিপদে বিদ্রোহে বিপ্লবে অপ্রকাশের আবেশ কাটিয়ে মানুষ আপনাকে প্রবল আবেগে উপলব্ধি করতে চায়।

একদিন এই কথাটি আমার কোনো-একটি কবিতায় লিখেছিলেম। বলেছিলেম আমার অন্তরতম আমি আলস্যে, আবেশে, বিলাসের প্রশ্রয়ে ঘুমিয়ে পড়ে; নির্দয় আঘাতে তার অসাড়তা ঘুচিয়ে তাকে জাগিয়ে তুলে তবেই সেই আমার আপনাকে নিবিড় করে পাই, সেই পাওয়াতেই আনন্দ।

সাময়িক পত্রে প্রকাশ

গ্রন্থে সন্নিবেশ-ক্রমে উল্লিখিত

সাময়িক পত্রে নামান্তর— ১ তোমরা এবং আমরা
২ নরনারী
৩ সভাভঙ্গ

কণ্টকের কথা[৪]	সাধনা	অগ্রহায়ণ ১৩০০	৬২
নিরুদ্দেশ যাত্রা	সাধনা	পৌষ ১৩০০	১৩৭

---

৪ তুলনায় সমালোচনা— সাধনা (১৩০০), সোনার তরী (১৩০০ ও ১৩০১), কাব্য-গ্রন্থাবলী (১৩০৩), কাব্যগ্রন্থ ৩ (১৯১৫) ও সোনার তরী (১৩৩৪) -ধৃত নামান্তর।

কণ্টক ও ফুল— কাব্যগ্রন্থ ৫ (১৩১০) -ধৃত নামান্তর।

কণ্টকের কথা— সোনার তরী (১৯৩৯) হইতে অদ্যাবধি প্রচলিত নাম।

রচনাপ্রসঙ্গ-সংকলন : পুলিনবিহারী সেন ও কানাই সামন্ত

মূল্য ৬'০০ টাকা